স্বপ্ন লজ্জাহীন

স্বপ্ন লজ্জাহীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দিব এ ১৮ এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা ৭০০ ০০৭

অন্বেষা ৮৯এ, এন্ কে ঘোষাল রোড. কলকাতা ৭০০ ০৪২

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬১

সাহিত্য ধারা

প্রকাশক। রমা ভট্টাচার্য
২৬ সেণ্ট্রাল রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩২

মুদ্রক । শ্রীশিশিরকুমার সরকার । শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৭

স্বপ্ন লজ্জাহীন

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধ্যেবেলায়। বিকেল থেকেই একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। তারিখটা মনে আছে, ১৯১৯ সালের ১৭ই জুলাই।

ছবিটা মনে পড়ে স্পষ্ট, যদিও বছর পাঁচেক আগের কথা। শিয়ালদার দিক থেকে ট্যাক্সিতে আসছিলাম। ট্যাক্সিতে আমি আর হেমন্ত। বৌবাজারের মোড়ের কাছে ট্র্যাফিকের লাল আলো, হেমন্ত পকেট থেকে সিগারেট বার করলো, আমি দেশলাই জ্বেলে প্রথমে হেমন্তকে ধরাতে গিয়ে নিভে গেল। দ্বিতীয় কাঠিতে দুজনেই ধরালাম, ধোঁয়া ছেড়ে ডান পাশে তাকাতেই চোখ পড়লো রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মনীষা। সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।...

এই পর্যন্ত লিখে আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে। সিগারেট শব্দটা ব্যবহার করার জন্যই এখন আমার সিগারেট টানার কথা মনে আসে। ড্রয়ার খুলে সিগারেট বার করে ধরালাম, প্যাকেটে আর মাত্র তিনটে সিগারেট, চকিতে আফসোস হয়, কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরার সময় আর একটা প্যাকেট কিনে আনলেই হতো। এই রোদ্দুরের মধ্যে এক ঘণ্টা বাদেই আবার সিগারেট কিনতে বেরুতে হবে। বড্ড গরম আজ, পাখাটা সম্পূর্ণ জোর করাই আছে, তুলে দিলাম জানলার সবগুলো পর্দা, আসুক একটু হাওয়া।

নতুন উপন্যাস শুরু করতে হবে। দিন দশেক ধরেই ভাবছি, এবার কী নিয়ে লেখা যায়। আমি সম্পূর্ণ কাহিনী কিংবা পুরো বিষয়বস্তু আগে ভেবে ঠিক করে নিতে পারি না। একটা কোনো দৃশ্য চোখে ভাসে অথবা মনে পড়ে কোনো একটা চরিত্র—সেখান থেকে শুরু করি, তারপর দুপুরবেলার আকাশে ভাসমান চিলের মতন গল্প যেখানে খুশি যায়।

এবার প্রথমে ভেবেছিলাম বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এই মর্মান্তিক ঘটনা, মুক্তিফৌজের নৈতিক সাহস ও শরণার্থী শিবিরের লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে একটা কিছু লিখবো। লেখা উচিত। কিন্তু দু-তিনদিন বাংলাদেশের রণ-প্রাঙ্গণে ঘুরে এবং শরণার্থী শিবির দেখে আমি নির্বোধ হয়ে যাই। আমি বুঝতে পারি, লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিশাল দুঃখের কথা লেখার মতন ক্ষমতা আমার নেই। সে-রকম ভাষা আমি এখনও শিখিনি। তাছাড়া ও-সব দেখলে লিখতে ইচ্ছে করে না, প্রচণ্ড রাগ হয়। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাই। কিন্তু ঘৃণা বা ক্রোধ থেকে সাহিত্য হয় না। ভালোবাসা ও করুণাই সাহিত্যের অবলম্বন। আমি একটা ক্লিশে ব্যবহার করলাম। উপায় নেই।

বাংলাদেশ বিষয়ে বেশ কয়েকদিন মুহ্যমান কিংবা মোহ্যমান থেকে তারপর মনে হয়, নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই লেখার নেই। নিজের জীবনের কোন খণ্ড; তৎক্ষণাৎ চোখে একটা দৃশ্য ভাসে। একজন দরিদ্র স্কুল মাস্টারের ছেলে; ধুতির ওপর সার্ট পরা, একুশ বাইশ বছর বয়েস, সাধারণ চেহারা, মাথায় অনেক চুল, সার্টে একটা বোতাম নেই—সে একটা বাগানওয়ালা বাড়ির লোহার গেট ঠেলে ঢুকলো। বাড়িটা উত্তর কলকাতায়। বাগানের এখানে সেখানে পাথরের জলপরী, পাশ দিয়ে লাল কাঁকর-বিছানো পথ। ছেলেটি খানিকটা হেঁটে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালো। একজন বুড়ো চাকর তাকে দেখেই বললো, আসুন। ছেলেটি চাকরটির সঙ্গে গিয়ে একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে বসলো। এই হলঘরেও অনেক পাথরের মূর্তি, দেয়ালে ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং দশ এগারোটা বিভিন্ন রকমের ঘড়ি। এই সব ঘড়ি সময়ের জন্য নয়। শিল্প সংগ্রহ। বুড়ো চাকরটি ভেতর মহলে গিয়ে ডাকলো, খোকাবাবু, দিদিমণি, মাস্টারবাবু এসেছে। ছেলেটি সোফার উপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। সে এ-বাড়ির দুটি ছোট ছেলেমেয়েকে পড়ায়। কিন্তু অত্যন্ত সংকুচিত, অপরাধীর মতন তার ভঙ্গি। যেন একটা কিছু বিরাট অন্যায় করেছে সে। আগের দিন তার হাতের ধাক্কা লেগে চায়ের কাপ উল্টে—কার্পেটে পড়েছিল। কাপটা ভাঙেনি, কিন্তু

কার্পেটে চায়ের দাগ···অবশ্য এজন্য কেউ কোনো কিছু বলেনি তাকে, শুধু বুড়ো চাকরটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল, ছাত্র-ছাত্রীর মা আড়াল থেকে···

এই দৃশ্যটি দিয়ে অনায়াসে উপন্যাস শুরু করা যায় আমারই জীবনের ঘটনা। প্লট চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। তবু ঠিক পছন্দ হয় না। দু-তিনদিন ধরে মনের মধ্যে দৃশ্যটাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করি। বার বার মনে হয়, কি যেন দু-একটা ছোটখাটো বিবরণ বাদ থেকে যাচ্ছে। ছেলেটির চটি জুতোয় কি পেরেক ওঠা ছিল? ছেলেটির, অর্থাৎ আমার? সেই বাগান বাড়িতে কি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল? এখন মনে পড়ছে না, কোনো না কোনো দিন ঠিক মনে পড়বেই।

আমি অন্য কোনো দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের যুদ্ধের ঘটনাই বেশি করে মনে পড়ে। সাধ হয়, কলম ছেড়ে দিয়ে রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ ছেলেদের সঙ্গী হই। একদিন গিয়েও ছিলাম একটি ক্যাম্পে, বলেছিলাম, আমাকেও আপনাদের দলে নিন্। আমারও তো জন্ম পূর্ব বাংলায়। উত্তর পেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি তো ভারতীয় নাগরিক। আমাদের লড়াইটা আমাদেরই লড়তে হবে—শেষ পর্যন্ত দরকার হলে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে সাহায্য চাইবো।

দু-তিনদিন সময় কেটে যায়। সারাদিন কত লোকের সঙ্গে মিশছি, কথা বলছি, রাস্তা দিয়ে ঘুরছি, অফিসে কাজ ও সন্ধের পর আড্ডা—কিন্তু কেউ জানে না, আমি সর্বক্ষণ আমার নতুন উপন্যাসের কথা ভেবে যাচ্ছি। একটা দ্বীপের দৃশ্য। ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি বা কাক-দ্বীপের কাছ থেকে যে-রকম ছোটখাটো দ্বীপ দেখা যায়। ঐ রকম একটা দ্বীপে আমি একবার গিয়েছিলাম ভরা বর্ষায় নৌকো চেপে। নিবিড় গাছপালা, খুব সাপের ভয়। গিয়েছিলাম সাত আট বছর আগে। কেন সেই দ্বীপের কথা এখন মনে পড়লো কে জানে! এবং মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, সেই দ্বীপে একটা সিমেন্টের বেদিতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে একজন রমণী। রমণীটির স্বামী দু-মাস আগে খুন হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। রমণীটি কাঁদে

না, কিন্তু তার চোখ-মুখে শান্ত কঠিন শোক। বিশাল সমুদ্রের সামনে মনে হয় তার শোক আরও বিশাল। রমণীটির মুখ অবিকল আমার চেনা একজন মহিলার মতন। যদিও আমার সেই চেনা মহিলা বিধবা নন এবং জীবনে যথেষ্ট সুখী, তবু আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, তাঁর দুঃখের দৃশ্যে তাঁকে খুব মানাবে। সমুদ্রের সামনে সেই শোকাভিভূতা মূর্তি অসম্ভব সুন্দর দেখায়। সেই রমণীর থেকে সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। তার মুখখানা অনেকটা আমার মতন। অনেকটা, কিন্তু আমি নয়, অন্য লোক। অর্থাৎ এই উপন্যাস থার্ড পার্সনে লেখা হবে।

দৃশ্যটা আমার বেশ পছন্দ হয়। দু-তিনদিন ধরে মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করি। খুঁটিনাটি যোগ হয়। দ্বীপের এক প্রান্তে সিমেন্টের বেদির উপর বসা সমুদ্রের দিকে মুখ করা বিষণ্ন রমণী, একটু দূরে দাঁড়ানো একজন তরুণ ওভারসীয়ার—এই দৃশ্যে সংলাপ যোগ করলেই হয়। সেই সংলাপ শুরু করা আমার পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা থেকে যায়। একটা দ্বীপে শুধু তো একজন নারী, একজন ওভারসীয়ার এবং ওদের মতন আর দু-চারজন মানুষ থাকবে না। ওখানকার চাষী, মজুর, জেলেদের কথা না বললে সম্পূর্ণ হবে না দ্বীপের কথা। কিন্তু কি করে বলবো? ঐ সব মানুষের সমস্যা আমি কিছুটা বুঝি, জীবনযাত্রা কিছুটা দেখেছি, কিন্তু ওদের ভাষা আমি জানি না। এজ্ঞে, গেইছিনু খেইছিনু— ইত্যাদি দু-একটা শব্দ লাগিয়ে অনেকে চাষী-মজুরদের সংলাপ ফোটায়, ও-সব আমার ক্ষমতার বাইরে। ওদের কথা ভালো করে না জানলে আমি লিখতে পারবো না। মনের মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছে থাকে বটে, একদিন সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে মিশবো, ওদের জীবনকে নিজের জীবনের মতন জানবো—তারপর লিখবো ওদের কথা—কিন্তু কবে তা হবে, জানি না। অনেক ইচ্ছেই জীবনে পূর্ণ হয় না।

দ্বীপের দৃশ্যটাও খারিজ করে দেবার পর আর কোনো নতুন দৃশ্য মনে পড়ে না। তাহলে কি নিয়ে লিখবো উপন্যাস? সকালবেলা চা-টা খেয়ে সাদা কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকি। হাতে খোলা কলম।

কলমটা প্যাডের প্রথম পাতার ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকে। আমি একটুও ছবি আঁকতে জানি না, মানুষের মুখ আঁকতে গেলে খোক্কসের মতন দেখায়—এলোমেলো রেখায় পাতা ভরে যায়। সে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। পরের পাতায়, আচম্বিতে বিনা নোটিশে আমার কলম কিছু লিখতে শুরু করে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওকথাগুলো আমি লিখিনি, আমার কলমই লিখেছিল, কারণ ওকথাগুলো আমি এক মুহূর্ত আগেও ভাবিনি।

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধেবেলায়। বিকেল থেকেই একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। তারিখটা মনে আছে, ১৯১৯ সালের ১৭ই জুলাই।

একটা উপন্যাস কোন জায়গা থেকে শুরু হবে এবং কোথায় শেষ হবে তা আমি আজও জানি না। যেখানে শেষ হয়, তারপর কি আর কিছু নেই? যেখানে আরম্ভ—তার আগেও কি জীবনের অনেক কথা বাকি থাকে না? সেদিন বৌবাজারের মোড়ে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা দিয়েই বা কেন শুরু হলো? তার বহু আগে থেকে আমি মনীষাকে চিনি। সেদিনই যে মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি, তাও নয়। তার আগে এবং পরে মনীষা সম্পর্কে অনেক ভুল করেছি। স্বপ্নে মানুষের যেমন অনেক ভুল হয়ে যায়।

আরম্ভের ঐ কথাগুলো লেখার পরই সেদিনকার সন্ধেবেলায় সব ক'টি মুহূর্তের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এমনকি, সিগারেট ধরিয়ে প্রথম বার ধোঁয়া ছেড়ে তাকানো পর্যন্ত। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কেন? যে মেয়েটিকে আমি এত ভালোবাসি, যার কথা আমি সব সময় ধ্যান করি, তাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পাওয়া মাত্র কেন আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম? স্বাভাবিক ছিল না কি, 'আরো মনীষা' বলে চেঁচিয়ে ওঠা? সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়া?

কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

মনীষার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল, সে তার গভীর কালো চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল আমাদেরই ট্যাক্সির দিকে। অর্থাৎ

ও আমাকে আগেই দেখেছে। মনীষা চোখ ফেরায়নি। আমি ফিরিয়ে নিয়েছি।

চোখ ফিরিয়েই আমি দেখলাম হেমন্তকে। হেমন্ত মনীষাকে দেখেনি। ট্যাক্সির দু'দিকের জানালা আমাদের দু'জনের। ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলছে, এক্ষুনি সবুজ হবে। আমি আবার তাকালাম মনীষার দিকে, রাস্তার ওদিকে। মনীষা তখনও চেয়ে আছে ট্যাক্সির দিকে। ঠোঁটে সামান্য হাসি, চোখে কৌতুক—সাধারণ যে ভঙ্গিতে তাকায় আমার দিকে।

আবার চোখাচোখি হলো, আবার আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

অপরাধ করে শিশু অনেক সময় চোখের দিকে তাকাতে পারে না। পড়া না পারলে কিংবা মিথ্যে কথা বললে ছাত্র মাষ্টারমশায়ের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি কেন ? মনীষার চেয়ে আমি বয়েসে পাঁচ বছরের বড়, আমি যে-কোন সময়ে ওর চুলে হাত দিয়ে চুল এলো-মেলে করে দিতে পারি, কথা বলতে বলতে ওর পিঠে হাত রাখতে, 'এই দুষ্টু মেয়ে' বলে গালে টোকা দিয়েছি সব মিলিয়ে তিন বার, আমি কেন ওর দিকে চোখ পড়লে চোখ সরিয়ে নেবো ?

এবারও আমি তাকালাম হেমন্তর দিকে। ও এখনো দেখতে পায়নি।

বৌবাজারের মোড়ে ভিড়ে, গাড়ি ঘোড়ার জটলায়—সন্ধে সাড়ে ছ'টায় মনীষাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবো, এবং একা—এ রকম তো কখনও ভাবিনি। তাই আমার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যায়।

লাল থেকে সবুজ। ট্যাক্সি চলন্ত। এবার বেপরোয়া হয়ে আমি আবার তাকালাম মনীষার দিকে। একটা ট্রাম আড়াল করলো মনীষাকে।

রাস্তার ওপারে এসে হেমন্ত বললো, এখন কোনদিকে যাওয়া যায় ? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

আমি শুকনো গলায় বললাম, কোথায় যাওয়া যায়, বল্ তাহলে ?

—পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাবি ?

—গেলে হয়।

—অবিনাশকে ডাকলে হয় না ?

—হেমন্ত, শোন্‌।

—কী ?

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সামনে আবার ট্রাফিকের লাল আলোয় ট্যাক্সি থেমেছে। হেমন্ত মুখ ফিরিয়েছে আমার দিকে, আমি চুপ করে আছি। হেমন্তর চশমার পুরু কাচের আড়ালে ওর উদ্বেগহীন চোখ।

—মনে হলো মনীষাকে দেখলাম। বৌবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

চশমার আড়ালে হেমন্তর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে বললো, কোথায় ?

—বৌবাজারের কাছটায়। ঠিক মনীষা কিনা জানি না, মনে হলো অনেকটা ওর মতন।

—একা ?

—তাই তো মনে হলে।

—ডাকলি না ? আমাকে বললি না কেন ?

—ভালো করে দেখার আগেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

—সর্দারজী, ট্যাক্সি ঘুমা লিজিয়ে।

হেমন্তর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না। মনীষাকে কেউ কোনোদিন কখনো কোনো রাস্তায় একা দেখেনি। হঠাৎ একদিন দেখলে কি কেউ তাকে ফেলে চলে যেতে পারে ?

হেমন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু বিরক্ত। এইসব ভিড়ের রাস্তায় ট্যাক্সি ঘোরানো সহজ নয়। হেমন্ত অনবরত তাকে তাড়া দিচ্ছে। গাড়ি ঘোরানো হলো, হেমন্ত আমাকে বললো, কোথায় ? কোন জায়গাটায় ?

মনীষা সেখানে নেই।

একটু আগে এই জায়গাটাকে যে-রকম দেখে গিয়েছিলাম, এখনও অবিকল সেই রকম আছে। পানের দোকানে পারাচটা আয়না, কবিরাজী ওষুধের দোকানের বেঞ্চের ওপর বসা দুই বৃদ্ধ, ফুটপাতে

আড্ডায় বিভোর পাঁচ যুবক, রিকশাওয়ালা এখনও খৈনি ডলছে, পাঁচটি শিশু নিয়ে এক জোড়া স্বামী স্ত্রী—সবাই আছে, শুধু মনীষা সেখানে নেই।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমি আর হেমন্ত সেখানে নেমে পড়লাম। খুনের তদন্তের মতন জায়গাটাকে খুঁজতে লাগলাম তন্ন তন্ন করে। মনীষা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটা এখনও খালি, আর কেউ দাঁড়ায়নি। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করলে মনীষার পায়ের ছাপও দেখা যাবে।

—তুই ঠিক দেখেছিলি? এখানেই তো?

—হ্যাঁ এখানেই।

—তাহলে কোথায় গেল?

রাস্তার অন্য যে সব লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে কি জিজ্ঞেস করা যায়, মশাই, একটু আগে এখানে যে একটি মেরুন রঙের শাড়িপরা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে কোথায় গেল?

—চল হেমন্ত, ও চলে গেছে!

হেমন্ত আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কোথায় গেল?

আমি হেসে বললাম, তা আমি কি করে জানবো?

—তুই একটা কীরে? মনীষাকে দেখেও তুই তখন কিছু বললি না?

—হয়তো মনীষা নয়। ওর মতন দেখতে অন্য কেউ।

হেমন্ত আমার কথায় গ্রাহ্য করলো না। চকিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, কোথায় যেতে পারে?

মনীষা ট্রামে ওঠেনি। কারণ, ওখানে ট্রাম দাঁড়ায় না। ট্যাক্সি নিয়েছে? এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি পেয়ে গেল? সন্ধেবেলা এই সব অঞ্চলে ট্যাক্সি পাওয়া এক হুলস্থুল ব্যাপার।

হেমন্ত বললো, ঐ যে একটা ফরটি সেভেন বাস যাচ্ছে না? মনীষার বাড়ির পাশ দিয়ে যায়। চল্—

আমাদের অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠে সেই বাসকে অনুসরণ করলাম। হেমন্ত সব ব্যাপারে চূড়ান্ত না দেখে ছাড়ে না। ও রাস্তার

সমস্ত ট্যাক্সি ও বাসকে ওভারটেক করে উঁকিঝুঁকি মারছে। ফরটি সেভেন বাসে বড় ভিড়, ভেতরে মনীষা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হেমন্ত তবু সেই বাসটাকে ছাড়বে না—

সেই মেঘলা সন্ধেবেলা মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি। তারিখটা মনে আছে, ১৯৬৯ সালের ১৭ই জুলাই।

তারিখটা কেন মনে আছে? স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ইতিহাসের তারিখ আমি কখনো মুখস্থ রাখতে পারতুম না। শুধু ইতিহাসের রাজারাজড়ার নয়, চেনাশোনা কারুর বিয়ের তারিখ, জন্ম তারিখও মনে রাখতে পারি না আমি। তবু ঐ তারিখটা কেন মনে আছে? একটু ভাবতেও হলো না, লিখতে গিয়ে আপনিই কলম থেকে বেরিয়ে এলো, ১৯৬৯ সালের ১৭ই জুলাই। ঐ তারিখটার বিশেষত্ব কি? লেখা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলুম হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলে হতো, কিন্তু হেমন্ত এখন কলকাতায় নেই।

সেদিন হেমন্ত আর আমি ট্যাক্সিতে কোথা থেকে আসছিলাম? শুধু মনীষার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য ব্যাপার নয়, আমাদের পক্ষেও সন্ধেবেলা বৌবাজারের কাছ দিয়ে ট্যাক্সি করে আসাটা একটু অসাধারণ। আমরা সন্ধ্যের দিকে সাধারণত চৌরঙ্গি পাড়াতেই—। ও, সেদিনটা ছিল ছুটির দিন, আমরা শিয়ালদা থেকে ধরেছিলাম ট্যাক্সি। সকালবেলা চব্বিশ পরগণার দিকনগরে সুবিমলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারিখটা সেইজন্যই মনে আছে।

সুবিমলের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ হয়েছিল ঐদিন। সুবিমল হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার জন্ম ১৯৩৩ সালের ১৭ই জুলাই। আমার বিয়ে হয়েছিল আমার এক জন্মদিনে—১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই। আমার জন্মদিন আর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি একই দিনে হয়। আবার দ্যাখ, তখন বউকে বলেছিলাম বিয়ের ঠিক সাত বছর পর বাড়ি বানাবো—আজ ঠিক সাত বছর—১৯৬৯'র ১৭ই জুলাই।

সুবিমলের অনেক কিছুই অদ্ভুত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সুবিমল বিয়ে করেছে সবচেয়ে আগে, এবং বিয়ের অনেক আগে

থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, ওর ছেলের নাম রাখবে মানসপুত্র। ছেলে না হয়ে মেয়ে হওয়ায় সুবিমল একটুও বিচলিত না হয়ে নাম রেখেছে মানসী। সুবিমল ওর বাড়িতে দুটো কদম গাছ লাগিয়েছে, তার তলায় বসে ও রাত্রিবেলা বাঁশী বাজানো শেখে। অবশ্য শুধু শীতকালে, তখন সাপের ভয় থাকে না।

তার আগে আমি কোনো গৃহপ্রবেশ উৎসবে যাইনি। ঐ উৎসব কি রকম হয়, আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার অন্যান্য বন্ধুরা তখন বাউন্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া ধরনের, আর সুবিমল ম্যাজিকের মতন একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললো, রীতিমতন বাগান ও পুকুর সমেত।

আমি ভেবেছিলাম, গৃহপ্রবেশের উৎসবে গিয়ে দেখবো, একটা ফাঁকা বাড়ি, কোনো আসবাব নেই, সব ঘরে তালাবন্ধ। প্রথমে সদর দরজা ও তারপর এক এক করে প্রত্যেক ঘরে তালা খোলা হবে, আমরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বা হিপ হিপ হুররে ধরনের আওয়াজ করবো। ইঁট পেতে উনুন বানানো হবে, তারপর পিকনিকের মতন খিচুড়ি ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়া।

বস্তুত ব্যাপারটা সে রকম নয়। মাটির ঘট ও ডাব থাকে, পুরুত এসে মন্ত্র পড়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও ঠাকুমা-দিদিমারা আসেন। ঠাকুমা-দিদিমারা বলেন, আমাদের বিমু একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। বন্ধু-বান্ধবদের কোনো ভূমিকাই থাকে না সেখানে। আমি আর হেমন্ত বেশ খানিকটা নিরাশ হয়েছিলাম।

শিয়ালদায় এসে পৌঁছেছিলাম সন্ধে ছ'টা আন্দাজ। একটু আগে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তখনও পড়ছে টিপিটিপি করে, আকাশ দারুণ মেঘলা। ট্রেনে বসবার জায়গা পাইনি ; এসেছি প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মেজাজ খারাপ থাকার পক্ষে উপযুক্ত সময়।

হেমন্ত বলেছিল, সুবিমল যে বাড়ি বানালো, ঐ বাড়িতে ও থাকবে কতক্ষণ ? সারাদিন অফিস, তারপর প্রত্যেকদিন দুবার করে এই ট্রেন জার্নির ধকল।

আমি বলেছিলাম, তবু তো নিজের বাড়ি। সুবিমলরা বাঙাল,

এতদিন প্র্যাকটিক্যালি রিফিউজি ছিল, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি নাগরিক হয়ে গেল।

হেমন্ত অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, নিজের বাড়ি! তুই চোখ বুজে তিন চারবার 'নিজের বাড়ি' কথা দুটো উচ্চারণ কর তো! দ্যাখ তো, কিছু ছবি ভেসে ওঠে কি না।

শিয়ালদা স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। ট্যাক্সি খোঁজার জন্য লোকজনের ছুটোছুটি, কুলিদের ধাক্কা, ভিখিরির ঘ্যানঘ্যানানি, ফেরিওয়ালার চিৎকার। আমি হেমন্তর কথামতন সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে তিন চারবার বললাম, নিজের বাড়ি।

হেমন্ত বললো, দাঁড়া, আগে কিছু বলিস না! আমি দেখে নি।

হেমন্ত চোখ বুজলো। বিড় বিড় করলো, নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি!

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, তুই কি দেখলি?

—দূর ছাই, আমি কিছু দেখতে পেলাম না। আমার চোখে শুধু সুবিমলের বাড়িটাই ভেসে উঠলো। যদিও ও-রকম কোনো বাড়ি আমি নিজের বাড়ি হিসেবে চাই না।

—সত্যি আর কিছু দেখিস নি?

—না।

—সুনীল, তুই খুব অনেস্ট। তুই তো অনায়াসেই বানিয়ে বানিয়ে একটা চমৎকার বাড়ির বর্ণনা দিয়ে দিতে পারতিস। সমুদ্রের পারে চারপাশে ঝাউ গাছ।

—তুই কি দেখলি?

—আমি কোনো বাড়িই দেখিনি।

—তা হলে?

—আমি একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। আমি আজকাল চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই।

—কাকে? আমি চিনি?

—এখন বলবো না—

ঐ চোখ বোজার খেলাটার জন্য আমাদের মেজাজটা একটু ভালো হয়ে গিয়েছিল। এ রকম মাঝে মাঝে করি।

একটু ভিড় কমলে আমরা ট্যাক্সি পেয়েছিলাম। তারপর বৌবাজারের মোড়ে মনীষাকে…। মনীষা সম্পর্কে সেই আমি প্রথম ভুল করি—আমি মনীষাকে দেখতে পেয়েও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম…

হেমন্ত তখন সাতচল্লিশ নম্বর বাসটাকে তাড়া করে যাচ্ছে ট্যাক্সি নিয়ে। বাসটাকে বেশ খানিকটা পেরিয়ে এসে হেমন্ত আমাকে বললো, সুনীল, তুই নেমে গিয়ে এ বাসটায় উঠে পড়্। দ্যাখ, ওতে মনীষা আছে কিনা। এক স্টপ পরে নেমে পড়বি। আমি তোকে ফলো করছি।

—যাঃ, অতটা দরকার নেই।

—যা-না, আমি বলছি দেখে আয়। মনীষা নিশ্চয়ই ঐ বাসে উঠেছে।

—তুই যা।

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। আমি সব ব্যাপারেই অনেক দ্বিধা করি। হেমন্ত করে না। পরের স্টপে বাস থেকে নেমে হেমন্ত আবার ট্যাক্সিতে উঠলো। বিমর্ষভাবে বললো, না, মনীষা নেই।

কোথায় গেল তা হলে?

—যাক গে, অত ভেবে আর কি হবে!

—তুই একটা ইডিয়েট। মনীষাকে দেখেও ডাকলি না! কেন ডাকলি না বল তো?

—জানি না।

আমি সঙ্গে ছিলাম বলে?

—সে রকম কোনো কথা আমার মনেই পড়েনি।

—মনীষা তোকে দেখতে পেয়েছিল?

—হ্যাঁ!

হেমন্ত আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। হেমন্তর প্রশান্ত সুন্দর মুখে সহজেই মন খারাপের ছায়া পড়ে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম।

আমার মনে হলো, পথের উপর একলা মনীষাকে দেখতে পেয়েও ওর চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি মনীষাকে গভীরভাবে

প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুল।

মনীষার সঙ্গে দেখা করা খুব সোজা। ওর বাড়িতে গেলেই হয়। সব মেয়ের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করা যায় না। অনেক বাধা থাকে। টেলিফোন কিংবা চিঠির সুযোগ নিতে হয়। কিংবা তৃতীয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে। কিংবা পথের মোড়ে অপেক্ষা। মনীষার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো অসুবিধে নেই। সোজা ওদের বাড়িতে গিয়ে মনীষার নাম ধরে ডাকলে কেউ কিছু মনে করবে না।

মনীষার ডাকনামটা একটু অন্য ধরনের। মধুবন। ওর বাড়ির সবাই, এমনকি বন্ধু-বান্ধব অনেকেই ওকে মধুবন বলে ডাকে। মনীষার বদলে মধুবন হিসেবেই ও বেশি পরিচিত। যে-মেয়ের ভালো নাম তিন অক্ষরে, তার ডাকনাম চার অক্ষরে কেন, আমি জানি না। পৃথিবীতে এমন অনেক আশ্চর্য ব্যাপার থাকে। শুধু মনীষার বাবা ওকে ডাকেন খুকি বলে। এই নামটা আমার বেশ পছন্দ। অনেক মেয়েকে আমার খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, বয়েস যাই হোক না। 'আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটো-ছুটি করি'—এই ধরনের লাইন মনে আসে।

—দিদিমণি বাড়ি নেই।

—কখন বেরিয়েছেন ?

—এই আধঘণ্টা আগে।

চাকরের কাছে এরপর আর জিজ্ঞেস করা যায় না যে, দিদিমণি কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে।

সে কথাও জানার উপায় আছে। সদর দরজা থেকে ফিরে যাবার দরকার নেই। আর কিছু জিজ্ঞেস না করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া যায়। কিংবা চাকরকে জিজ্ঞেস করা যায়, দাদাবাবুরা আছেন তো ?

মনীষার দুই দাদা এবং তাঁদের স্ত্রীদের আমি অনেকদিন চিনি। অরুণ আমার ক্লাসমেট ছিল। বরুণদা ওর চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। অরুণের স্ত্রী সুজয়ার সঙ্গে আমার ইয়ার্কি'র সম্পর্ক। সীমাবৌদি আমার ছোট মাসীর বন্ধু ছিলেন। মনীষার দিদি ঊষাদিও আমাকে ভালোই চেনেন। বিয়ে করেননি ঊষাদি। উনি নামকরা সমাজসেবিকা, রিফিউজি মেয়েদের হাতের কাজ শেখাবার জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান করেছেন, একবার এম-এল-এ হয়েছিলেন।

এ বাড়িতে অনেক মানুষজন আসে, আমি হঠাৎ দেখা করতে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু সদর দরজার কাছে মনীষার খোঁজ করে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ওকে আর একা পাবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমার দোষ এই, ওপরে উঠে গেলে, অরুণ কিংবা বরুণদা কিংবা ঊষাদি'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, আমি তাঁদের কাছে আর মনীষার কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। এমন ভাব দেখাতে হয়, যেন আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। এরকম কতদিন গেছে, ও বাড়িতে গিয়ে অরুণ, বরুণদা বা ঊষাদি'র সঙ্গে গল্প করতে করতে চাতকের মতন প্রতীক্ষা করেছি মনীষার জন্য।

বরুণদার দারুণ নেশা ক্যারাম খেলার। দেখলেই জোর করে ক্যারামে বসিয়ে দেবেন। আমি হয়তো বরুণদার সঙ্গে ক্যারাম খেলে খেলে আঙুল ব্যথা করছি, আর পাশের ঘরে শুনতে পাচ্ছি মনীষার গলা। তখন আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, আমি শুধু মনীষার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি, আর কারুর সঙ্গে নয়। মনীষা যাতে পাশের ঘর থেকে আমার উপস্থিতি টের পায়, তাই আমি কথা বলেছি জোরে জোরে, হো-হো করে হেসে উঠেছি অকারণে। মনীষা আসেনি। খেলাটেলা শেষ করে যখন আমি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ হয়তো সিঁড়ির মুখে মনীষার সঙ্গে দেখা। মনীষা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এই তুমি কখন এসেছো? বাঃ, আমাকে ডাকলে না যে?

বাড়ির সবার সামনেই মনীষা আমাকে তুমি বলে। কেউ অস্বাভাবিক মনে করে না। বাংলা গল্প উপন্যাসে ছেলেমেয়েদের

মধ্যে আপনি থেকে তুমি-তে নামার জন্য অনেকগুলো পৃষ্ঠা খরচ হয়। অথচ অনেক বাড়িতেই আমি দেখেছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাবলীল তুমি ব্যবহার। হেমন্তকে অবশ্য মনীষা আপনি বলে ডাকে। এই নিয়ে হেমন্তর একটু ক্ষোভ আছে। যাক্‌ এ সম্পর্কে পরে কথা হবে।

মনীষার সঙ্গে আমি ওদের বাড়ির বাইরে দেখা করার চেষ্টা করেছি। সুবিধে হয়নি। মনীষার মধ্যে যে সারল্যের আমি বন্দনা করি, সেই সারল্যই অনেক সময় আমার পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারল্য কিংবা দুষ্টুবুদ্ধি।

মনীষা তখন সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। সার্কুলার রোড দিয়ে আমি বাসে চেপে অফিসে যাচ্ছি, জানালার ধারে বসে-ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা বাস স্টপে মনীষা দাঁড়িয়ে আছে। মনীষাই আমাকে দেখে বলেছিল, এই, কোথায় যাচ্ছো?

এর আগে মনীষা দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল বেশ অনেকদিন ধরে। প্রায় দু'মাস ওকে দেখিনি। ভ্রমণের পর ও আরও সুন্দর হয়ে এসেছে।

—উঠে পড়ো, এই বাসটায় উঠে পড়ো।

মনীষা হেসে বললো, এই বাসে গেলে আমার হবে না।

—কোথায় যাচ্ছো?

—ইউনিভার্সিটিতে।

আমারই তো নেমে পড়া উচিত। ধড়মড় করে উঠতে উঠতে বাস ছেড়ে দিল। হন্তদন্ত হয়ে চেঁচালুম, রোক্‌ কে, রোক্‌ কে! অফিসের সময়ে বাস এত সহজে থামে না। দু'একজন কি যেন টিপ্পনি কাটলো। আমি তো এখন কিছু শুনতে পাবো না। ঠেলেঠুলে এলাম দরজার কাছে। এত চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না। লম্বা এক স্টপ বাদে বাস থামলো। সেখান থেকে হনহন করে হেঁটে এলাম মনীষার দিকে।

মনীষা নেই।

এর মধ্যে আরও তিন চারটে বাস চলে গেছে, মনীষা তো

যেকোনো একটাতে উঠে পড়তেই পারে। আমি তো মনীষাকে অপেক্ষা করতে বলিনি। আমি তো বলিনি, দাঁড়াও, আমি আসছি। তাছাড়া, আমি অফিসে যাচ্ছি, মনীষা কলেজে যাচ্ছে, রাস্তায় যদি দেখা হয় তাহলে দু'একটা কথা বলাই তো স্বাভাবিক, গতিপথ তো পাল্টাবার কথা নয়।

তাড়াহুড়ো করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেও দেখা না পেলে কি রকম একটু বোকা বোকা লাগে না? সেই ভাবটা কাটাবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরালাম। এরপর কল্পনার সিরিজ শুরু হলো। যদি আমি বাস থেকে নেমে পড়তে পারতাম. যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতাম মনীষার। বলতাম, মনীষা আজ কলেজে যেতে হবে না।

মনীষা কী উত্তর দিত?

মনীষা হেসে বলতো, কলেজে তো যাচ্ছি না। আমি এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।

—ঐ একই হলো। অনেক সাহেবরা আজকাল ইউনিভার্সিটিকে স্কুল বলে। আজকে ক্লাস কাটো।

—বাঃ কতদিন ক্লাস নষ্ট হলো। আজই তো যাচ্ছি অনেকদিন বাদে।

—সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কবে ফিরলে?

—পরশু। খুব ঘুরলাম। দারুণ ভালো লেগেছে, দারুণ!

—কতদূর গিয়েছিলে?

—একেবারে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—ওখানে সমুদ্রে স্নান করেছিলে?

—বাঃ, করবো না!

—ওখানে সমুদ্রে স্নান করার সময় কি তোমার আংটি হারিয়ে গিয়েছিল?

মনীষা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। ভুরু কুঁচকোলেও ওর চোখের কোণ থেকে হাসি হাসি ভাবটা কখনো মেলায় না। দু'এক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, তার মানে? হঠাৎ আমার আংটি হারাবার কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। সমুদ্রে স্নান করতে করতে

তোমার আংটিটা হারিয়ে গেল।

—তারপর একটা রাঘব বোয়াল সেটা টুপ করে গিলে ফেললো ?

হাসতে হাসতে মনীষা বললো, স্বপ্ন দেখেছিলে না ঘেঁচু! এমন সব চট্ করে বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারো! চলি আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও! সত্যি আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। তোমার নীল পাথর বসানো একটা আংটি ছিল, সেটা দেখছি না কেন ?

—সেটা আমার নয়, ছোট বৌদির। আমি অত জিনিসপত্তর হারাই না। তোমার অফিস নেই ?

—আজ অফিসে না গেলে কি হয় ? চলো আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাই।

—কেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাবে কেন ? বই নিতে হবে ?

না, না। ওখানকার মাঠে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

—গল্প করার জন্য অতদূরে যেতে হবে ?

—চমৎকার জায়গা। আগে যখন ওখানে পড়তে যেতাম, তখন দেখতাম, ওখানকার সবুজ মাঠে চমৎকার জোড়ায় জোড়ায় ছেলে মেয়েরা বসে গল্প করছে। দেখে আমার এমন লোভ হতো—

মনীষা চুপ করে রইল একটুক্ষণ। আমি উতলা হয়ে বললাম, চলো, চলো অত ক্লাসের মায়া করতে হবে না। একদিন একটু বেড়ানো যাক্।

—দাঁড়াও, ভাবছি।

—কি ভাবছো ?

—তোমার সঙ্গে যাবো কি না।

—অত ভাবাভাবির কি আছে। চলো গেলেই ভালো লাগবে। একটা ট্যাক্সি নিই বরং। ট্যাক্সি এই ট্যাক্সি—

আসলে এসব কিছু না। মনীষা অনেকক্ষণ আগে বাসে চেপে চলে গেছে। আমি সিগারেট টানতে টানতে এই ধরনের কথা ভাবছিলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে কবিতা লিখলাম "বাস স্টপে তিন

মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ"।

পরদিন ঠিক সেই জায়গায় আগে থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে। মনীষা এলো না! আজ কি ইউনিভার্সিটি বন্ধ? একটু দূরেই মনীষাদের বাড়ি, অনায়াসে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু আমি তো বাইরে দেখা করার জন্যই—

তার পরের দিন আবার। সেদিনও মনীষা এলো না। আমার ধৈর্য তখনও ফুরোয়নি তিন চারদিন বাদ দিয়ে আবার গেলাম। অফিসে অনবরত লেট হচ্ছে। চুলোয় যাক অফিস।

তিনটে সিগারেট শেষ করার পর দূরে দেখতে পেলাম মনীষা আসছে। হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগলো। মনীষাদের বাড়ির কাছে আমি ওর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছি, ও দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু এটা কি আমায় মানায়? আমি মনীষাকে কোনোদিন প্রেমপত্র লিখিনি, আড়ালে কখনো ভালোবাসার কথা জানাইনি—তার দরকার হয় না। ওদের বাড়িতে কিংবা কোনো নেমন্তন্নে বা পিকনিকে মনীষার সঙ্গে দেখা হয়, সাবলীল হৈ-চৈ অনায়াস ঠাট্টা ইয়ার্কি, কোথাও কোনো বাধা নেই। মনীষা সেই ধরনের মেয়ে, যে ভালোবাসার কথা বলার জন্য আড়াল খোঁজে না। একদিন ওদের বাড়িতেই অরুণের ঘরে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় মনীষা ঢুকলো। হাতে একটা বড় চিরুণী, মনীষা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিল কিছুক্ষণ! হঠাৎ মনীষা একবার আমাকে বললো, এই, তোমার চুলগুলো এরকম কপালের উপর এসে পড়ে কেন? মাথা আঁচড়াও না বুঝি, চুলগুলো একেবারে পাখির বাসা করে দেখেছো!

আমাদের ছাত্র বয়সে চুলে তেল না দেওয়া এবং চুল না আঁচড়ানোই ফ্যাসান ছিল। আমার মাথা ভর্তি রুক্ষ বড় বড় চুল। মনীষা জোর করে আমার চুলে চিরুণি চালিয়ে দিল। আমার তখন মনে হয়েছিল, সেই চিরুণির স্পর্শের নামই ভালোবাসা।

সেই অনুযায়ী, আমার মনে হয়েছিল, আর পাঁচটা ছেলের মতন পথের মোড়ে মনীষার জন্য প্রতীক্ষা করা আমাকে মানায় না। অথচ নেশার মতন টানে আমি এসেছি। দূরে থেকে মনীষাকে সত্যি সত্যি

আসতে দেখে আমার লজ্জা করলো।

আমি চট করে সরে গেলাম। চলে গেলাম উল্টো ফুটপাতে, যাতে মনীষা আমাকে সহজে দেখতে না পায়। মনীষা বাস স্টপে দাঁড়াবার পর, আমি এমন করে অন্যমনস্ক ভাব করে হেঁটে যাবো, যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে মনীষা হাতব্যাগ থেকে চশমা বার করে পরলো। মনীষা সব সময় চশমা চোখে দেয় না এখন বোধহয় বাসের নম্বর দেখার জন্য—

ঠিক সেই সময় কোণাকুণি রাস্তা পার হয়ে আর একটি মেয়ে এসে মনীষার পাশে দাঁড়ালো। গল্প লেখার সুবিধের জন্য ওকে আমি মেয়ের বদলে ছেলে করে নিতে পারতুম। তাতে গল্প জমে ওঠার বেশ সুবিধে। কিন্তু ছেলে নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি মেয়েই, বেশ লম্বা, কমলা রঙের শাড়ি পরা—এর হাতেও বই খাতা। মেয়েটি চেনে মনীষাকে, দু'জনে গল্প করছে। মনীষা আজ সাদা শাড়ি পরা।

তৃতীয় ব্যক্তিটি ছেলের বদলে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমি চটে গেলুম। এর কোনো মানে হয় না। এখন আমি মনীষার সঙ্গে কথা বলবো কি করে? অন্য কারুর সামনে আমি একদম কথা বলতে পারি না। বেশি লাজুক হয়ে যাই। সেই জন্যই তো মনীষাকে একলা পাওয়ার ইচ্ছে।

তীব্রভাবে আশা করেছিলাম, মেয়েটি আগেই কোনো বাসে উঠে পড়বে। তা হলো না। এবং ওরা দুজনেই একটা লাল রঙের ডবল ডেকার বাসের দিকে এমন উদ্‌গ্রীব ভাবে তাকালো যে আমি বুঝতে পারলুম, ওদের পথ আলাদা নয়। এরপর আমার কি করা উচিত—আমি আর ভেবে পেলুম না। এক এক সময় এই রকম হয়, এই পৃথিবীর সব নিয়ম নীতির সঙ্গে হিসেব রেখে চলতে পারি না আমি। সব সময় যুক্তিতর্ক আর হিসেব মিলিয়ে তো সব ঘটনাও ঘটে না। খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ি। তখন রাশ আলগা করে দিই। শরীরটা যা করতে চায় করুক। আমার শরীর আর আমি তখন যেন আলাদা।

আমার শরীর দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেল এবং চলন্ত বাসে উঠে পড়লো।

মনীষা আর সেই মেয়েটি বসার জায়গা পায়নি। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে এখনও কি কথা বলছে। মনীষা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। চেনা মানুষকে দেখলে মানুষ এ রকম হাসে। কোনো বিস্ময় নেই। আমাকে ও অনেকক্ষণ আগে থেকেই দেখেছে, না এইমাত্র দেখলো—তাও বোঝার উপায় নেই কোনো।

আমি মনীষাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে দাঁড়ানো কন্ডাক্টর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমাকে বললো, টিকিট!

আর একটু পরে কি টিকিট চাওয়া যেত না? কিংবা আমাকে দেখলে কি মনে হয়, আমি পয়সা ফাঁকি দেবো? যাই হোক, এই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলার জন্য আমার শরীর পকেটে হাত ঢোকালো। ডান হাতের আঙুল তুলে আনলো অনেক খুচরো পয়সা। কন্ডাক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিতে গিয়েও হাত থেমে গেল। শরীর এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ক'টা টিকিট কাটবো? এটা শারীরিক ব্যাপার নয়, এ সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে।

এ তো এক সমস্যা! শুধু নিজের টিকিট কাটা যায় না। কিন্তু মনীষার সঙ্গে ঐ মেয়েটির? মনীষার সঙ্গে ওর তো বেশ ভাব দেখছি। মনীষা নিজে টিকিট কাটলে নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটিরও টিকিট কাটতো। কিংবা ঐ মেয়েটি কাটতো মনীষার। কিন্তু আমি মনীষাকে যে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মাঠে নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম? তাহলে ঐ মেয়েটি? বাসের এত লোকজনের মধ্যে বলবোই বা কি করে?

—তিনটে ধর্মতলা।

কন্ডাক্টরের বাড়ানো হাতে পয়সা তুলে দিলাম। টিকিট নিয়ে তার মধ্যে থেকে দুটো মনীষার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই নাও!

কথা বন্ধ করে মনীষা অবাক হয়ে তাকালো। তারপর তাকালো মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তাকালো মনীষার চোখে। মেয়েটি চকিতে আমার দিকে চেয়েই আবার চোখ ফেরালো। মনীষা মুচকি

হেসে মেয়েটিকে বললো, এই তোর টিকিট কাটা হয়ে গেছে। তুই আর কাটিস না। মনীষা আবার সেই অবাক চোখে আমার দিকে।

এত অবাক হবার কি আছে? আফটার অল, আমি মনীষার দাদার বন্ধু, হঠাৎ বাসে ট্রামে দেখা হলে তার টিকিট কাটাবো, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এবং সঙ্গে আর কেউ থাকলে—

ইউনিভার্সিটি বেশি দূরের পথ নয়। নামবার সময় মনীষা অপ্রত্যাশিত ভাবে বললো, কাল এসো আমাদের বাড়ীতে। একটা দরকার আছে।

মেয়েটিও ওখানেই নামবে। মেয়েটি যদি না নামতো, তাহলে বলাই বাহুল্য আমিও নেমে পড়ে মনীষাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর দিকের বাসে ওঠাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা হলো না। মেয়েটিও নামার সময় আমার দিকে তাকাবো না তাকাবো না ভাব করেও চকিতে একবার তাকালো, ঈষৎ লজ্জা ও ধন্যবাদ মেশানো হাস্যে বললো, চলি!

উঃ, এই সামান্য ঘটনাটা নিয়ে মনীষা এরপর আমাকে কি জ্বালান জ্বালিয়েছে! পরের দিন ওদের বাড়ীতে এক গাদা লোকের সামনে মনীষা বলে উঠলো, জানো বৌদি, সুনীলদাকে দেখলে মনে হয় ভালো মানুষ, কিন্তু পেটে পেটে এত—আমার বন্ধু শিবানী—তুমি চেনো তো, ছত্রিশের সি বাড়ীতে থাকে—সুনীলদা না তার জন্য বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। মনীষার সঙ্গের সেই মেয়েটার নাম শিবানী। জীবনে তাকে আগে কখনো দেখিনি।

সুজয়া, সীমা বৌদিরা কৌতূহলের সঙ্গে হাসছে। অরুণের একটু মুখ আলগা; সে-বললো, কি রে, তুই আবার মেয়েদের পেছনে হিড়িক দিচ্ছিস নাকি? ট্রেনিং নিয়েছিস? আমার কাছ থেকে আগে ট্রেনিং নে, না হলে প্যাঁক খেয়ে যাবি!

আমি চোখ দিয়ে মনীষাকে অনুনয় করতে লাগলুম। মনীষা থামলো না, দ্বিগুণ উৎসাহে বললো, আমার জন্য অসুবিধে হয়ে গেল, সুনীলদা শিবানীর সঙ্গে বেশি কথাই বলতে পারলো না। আহা, আমাকে একটু আগে থেকে বলে দেবে তো! আমি অন্যবাসে উঠতুম।

—কেন বাজে কথা বলছো! আমি মেয়েটিকে চিনিই না। একটাও কথা বলেছি ওর সঙ্গে?

—দেখেছো, দেখেছো, লজ্জায় কি রকম কান লাল হয়ে গেছে? তুমি ওর টিকিট কাটোনি?

বাঃ টিকিট কাটার মধ্যে কি আছে?

—ওর টিকিট কাটার পর আমাকে দেখতে পেয়ে বাধ্য হয়ে আমারটাও—শিবানী কিন্তু খুব ভালো মেয়ে, তোমার পছন্দ আছে—

অরুণ বললো, ভালো, কি রে! শিবানীর গালে তো মেছেতার দাগ আছে!

—এই দাদা, ভালো হবে না বলছি। আমার বন্ধুর নামে যা তা বলবে না। শিবানী খুব সুন্দর, পড়াশোনাতেও খুব ভালো।

—মধুবন, তুই এক কাজ কর না শিবানীকে একদিন বাড়িতে ডাক না, সুনীলও থাকবে। এখানেই যা কথাবার্তা বলার বলবে। মেয়েদের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা—বেচারার অবস্থা দু'দিনেই কাহিল হয়ে যাবে···যা টায়ারসাম-মেয়েরা একদম কথার ঠিক রাখে না—আমি তো হাড়ে হাড়ে জানি!

সুজয়া চোখ পাকিয়ে অরুণকে বললো, তুমিই জানো!

—বাঃ জানি না! তুমি ভাবছো তুমিই ফার্স্ট? এর আগে এগারোটা মেয়ের সঙ্গে—আমি তো প্রমিসই করেছিলাম, এক ডজন পুরো না হলে বিয়েই করবো না! সুনীল, তুই এই মেয়েটার সঙ্গে কদ্দিন ধরে চালাচ্ছিস রে?

গম্ভীর হয়ে থাকলে আরও রাগাবে। যে-কোনো উত্তর দিলে সেটারই অন্য মানে করবে। সুতরাং কোনো উত্তর না দিয়ে রাগ চেপে রেখে হাসিমুখ করে বসে রইলাম!

মনীষা বললো, সুনীলদার অফিস আলিপুরে, আর শিবানীর জন্য বাসে চেপে চলে গেল ইউনিভার্সিটির দিকে। তোমার অফিসের দেরি হয়ে যায় না?

অরুণ বললো, গভর্নমেন্ট অফিস তো, বারোটার আগে যায় না।

তুই সপ্তাহে কদিন দেখা করিস রে ?

মনীষার সঙ্গে বাইরে দেখা করার চেষ্টার এই পরিণতি। আরও দু'চারবার অনেক কায়দা কানুন করে বাইরে আলাদা দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম ঃ সুবিধে হয়নি। চিঠে লিখে কিংবা টেলিফোনে আমার এই ব্যাকুল ইচ্ছেটার কথা জানিয়ে কি মনীষার সঙ্গে দেখা করা যেত না ? যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি সে রকম চেষ্টা কখনো করিনি। আমার মনে মনে একটা ভয় ছিল, মনীষাকে কোনো চিঠি লিখলে ও বোধহয় বাড়ির সবাইকে সেই চিঠি দেখিয়ে দেবে। ওর বাড়ির লোক অবশ্য কেউ সেজন্য রেগে যাবে না বা গেট আউট বলবে না আমাকে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে জ্বালিয়ে মারবে। টেলিফোনেও সে রকম সুযোগ হয়নি।

কতবার বিনা কারণে টেলিফোন করেছি অরুণকে, যদি মনীষা প্রথমে এসে টেলিফোন ধরে। সে রকম ঘটেছে কদাচিৎ। সুজয়া কিংবা সীমা বৌদি ধরলে খানিকক্ষণ গল্প করার পর ওরাই ডেকে বলেছে, এই মধুবন, সুনীল টেলিফোন করেছে, কথা বলবি ? মনীষা তক্ষুণি এসে হালকা ইয়ার্কি শুরু করেছে। শিবানীর সঙ্গে আর দেখা করি না কেন ? শিবানী খুব দুঃখ করছিল। ও রোজ ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় বাস স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে —পরপর অনেকগুলো বাস ছেড়ে দেয়। কিংবা—ওর কোন বন্ধুর দাদা নাকি চেনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সে বলেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি লুঙ্গি পরে বাজার যায় আর মাছওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ! সত্যি ?

কোনো কোনোদিন প্রথমেই টেলিফোনে মনীষাকে পেয়ে আমি বলেছি, মনীষা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

—কি রকম জরুরী ? এক্ষুণি বলতে হবে ?

—না, এখন নয়। শোনো—

—তা হলে সেটা জরুরী কথা নয়। সে-কথা পরেও বলা যায়, তা কখনো জরুরী কথা হয় না।

—আর যদি এক্ষুণি বলি ?

—বলো। খুব তাড়াতাড়ি।

—কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

—আমার ভীষণ তাড়া আছে। আমাকে গানের ক্লাসে যেতে হবে।

—দ্যাখ খুকি, বেশি চালাকি করিস না তো! আমি তোর জন্য মরে যাচ্ছি, আর তুই—

মনীষা হাসতে হাসতে বললো, এই বৌদি, শোনো শোনো, সুনীলদা টেলিফোনে আমার কান মুলে দিতে চাইছে।

শুনতে পেলাম একটু দূরে সীমা বৌদির গলা, তুই-ই ওর নাকটা মুলে দে না!

তারপর মনীষা টেলিফোনে কি দিয়ে যেন একটা দারুণ আওয়াজ করলো, আমার কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম।

মনীষার সঙ্গে আমি এরকম ভাবে দেখা করতে চাই কেন? তাও বুঝিয়ে বলে দিতে হবে?

মনীষা আমাকে এরকম ভাবে এড়িয়ে যায় কেন? মনীষা তো কচি খুকী বা ন্যাকা নয়! মনীষা, আমাকে পছন্দ করে না?

তাহলে, শান্তনুর বিয়ের দিন তিনতলা ও চারতলার সিঁড়িতে মনীষার সঙ্গে আমার দেখা—সিল্কের শাড়িতে সপ্ সপ্ আওয়াজ করে মনীষা দ্রুত নেমে আসছিল, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, আমি নির্নিমেষে দেখেছিলাম ওর অবর্ণনীয় রূপ—মনীষা ধমকের সুরে বললো, এত দেরি করে এলে কেন? আমি উত্তর দিলাম না—মনীষা ওর মুঠো করা ডান হাত সোজা ঢুকিয়ে দিল আমার বুক পকেটে, কি যেন একটা রাখলো, বললো, তোমার জন্যই রেখেছিলাম এতক্ষণ—মনীষা আবার তরতর করে নেমে চলে গেল—আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি, দুটো চাঁপা ফুল—কেন? ফুল দুটোতে তখনও মনীষার হাতের ঘাম লেগে আছে, গন্ধ শুঁকলাম, মনে হলো, চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ ছাড়িয়েও তার মধ্যে আমি মনীষার হাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

ঘোর কাটাতে দু'এক মিনিট সময় যায়। সিঁড়িতে আমার পাশ দিয়ে আরও অনেক মানুষ নেমে যাচ্ছে, উঠছে, আমি কারুকে দেখছি না। তারপর নেমে এলাম নীচে। বর যে ঘরে বসেছে,

তার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মনীষা কথা বলছে হেমন্তর সঙ্গে। সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে মনীষা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর দুল। হাতে কোনো চুড়ি বা গয়না নেই। মনীষার গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, মুক্তোর রংও তো ধপধপে সাদা হয় না।

হেমন্ত বললো, দ্যাখো. মনীষা, এর কোনো মানে হয়? আমি এ বাড়িতে আর কারুকে চিনি না। আর সুনীলটা আমাকে একা ফেলে ওপরে চলে গেল!

আমি বললাম, আমি মনীষাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম!

মনীষা হাসতে হাসতে বললো, যা মিথ্যুক! তুমি তো সিঁড়িতে আমাকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলে। আমাকে দেখতেই পাওনি।

—যা সেজেছো না আজ, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলে, তাই দেখতে পাইনি।

নিজের প্রশংসা শুনলে তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মনীষার। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললো, এই তোমরা ঝুমনির মাকে দেখতে যাওনি কেন?

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে অনুভাদির?

—বাঃ, সে খবরও রাখেন না? খবরের কাগজে বেরিয়েছিল—

—আমি, হেমন্তকে বললাম, ঝুমনির মায়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। শিয়ালদা স্টেশনে একটা গোলমালে উনি লাইনের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভালো আছেন তো শুনেছিলাম।

—শুনেছিলে? একবার গিয়ে দেখতে পারো নি?

—কোথায় আছেন?

—মেডিক্যাল কলেজে। আমি আজ বিকেলেও গিয়েছিলাম, ঝুমনি এমন কাঁদছে—আমার আজ নেমন্তন্ন বাড়িতে আসতে ইচ্ছেই করছিল না!

হেমন্ত আর আমি একটু চুপ করে রইলাম। হাসপাতালে কারুকে দেখতে যাওয়া আমাদের দু'জনের ধাতে নেই। তবে অনুভাদির দুর্ঘটনার কথা শুনে মন খারাপ হয় ঠিকই। ব্যারাকপুরে একবার পিকনিকে অনুভাদি আর ঝুমনি আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল,

সেইখানেই প্রথম আলাপ। অনুভাদির মতন এমন হাসিখুশি সরল ভালোমানুষ খুব কমই দেখেছি—বয়েস চল্লিশের বেশি, তবু প্রাণশক্তি অফুরন্ত।

অনুভাদির কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আমার পাপ মন। আমার মনে হয়, মেডিক্যাল কলেজে অনুভাদিকে দেখতে গেলে মনীষার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেত। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুজন এক সঙ্গে—

হেমন্ত বললো, আমারও নেমন্তন্ন বাড়িতে আসতে ভালো লাগে না। কি রকম দম বন্ধ লাগে। চল সুনীল, এবার কেটে পড়ি। দেখা দেওয়া তো হয়ে গেছে।

মনীষা, বললো, এই, না, যাবেন না। মোটেই উচিত নয়, শান্তনুদা তাহলে কি মনে করবে?

—আমরা এসেছিই তো। এখন ঐ মাংসের ঘ্যাঁট আর বুক-জ্বলা ফ্রাইড রাইস যদি না খাই, তাতেও খারাপ দেখাবে? মনীষা তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।

—ধ্যাৎ!

—অরুণ কোথায়? সুজয়া?

—দাদা পরিবেশন করছে ওপরে। বৌদি কনে সাজাচ্ছে।

—মনীষা, প্লীজ চলো, অন্তত একটু ঘুরে আসি। বড্ড গরম এখানে।

—ভ্যাট, আমি কোথায় যাবো! আমি ওপরে চললুম।

হেমন্ত মনীষার হাত ধরে বললো, একটুখানি এসো না! এখনও বিয়ে আরম্ভ হতে দেরি আছে। দশটায় লগ্ন—

হেমন্ত আন্তরিক ভাবে জোর করতে পারে, আমি পারি না। মনীষা আসতে বাধ্য হলো। বেরুবার মুখে যার সঙ্গে দেখা হলো, আমরা বললাম, আসছি এক্ষুনি, একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে হচ্ছিল শান্তনুর। একটু হেঁটে এলেই পদ্মপুকুর। আকাশে মেঘ-বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই। গাছগুলি শান্ত, পুকুরের জলে তরঙ্গ নেই, আমি মনীষা আর

হেমন্ত তিন বন্ধু মিলে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ, মনীষা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত।

আমার হাতের মুঠোয় তখনও সেই চাঁপা ফুল দুটো। মুঠো খুলে মৃদু হেসে আমি বললাম, মনীষা, তোমার জন্য আমি এই চাঁপা ফুল দুটো নিয়ে এসেছিলাম। এতক্ষণ দিতে পারিনি।

হেমন্ত বললো, দুটোই তুই দিসনি। একটা আমাকে দে। আমরা দুজনে দুটো ফুল দিই মনীষাকে। এই নাও—'ভালো যদি বাসো সখী, কি দিব গো আর—কবি হৃদয় এই, দিনু উপহার।

মনীষা ফুল দুটো নাকের কাছে গন্ধ শুঁকলো। কৌতুক হাস্যে বললো, উঃ, সিগারেট খাওয়া হাতে এতক্ষণ ধরে আছো, তোমাদের হৃদয়ে সিগারেটের গন্ধ হয়ে গেছে।

অহংকারী নারীর মতন ও ফুল দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে।

কোমরে গোঁজা ছিল রুমাল, বার করলো। কালিম্পং-এ কুয়াশার মধ্যে লুপ্ত চাঁদ যে-রকম দেখেছিলাম, সেই রকম ওর নাভি দেখতে পেলাম চকিতে। ঝকঝকে তকতকে নিকোনো আঙিনার মতন ওর পেটের কাছের জায়গাটা। সাটিনের মতন মসৃণ ত্বক।

রুমাল দিয়ে আলতো করে মুছে মুছে মনীষা বললো, এবার আমাকে যেতে হবে। তোমরা আর যাবে না?

হেমন্ত হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, না। তুমি একা যাও।

যা বলছিলাম, মনীষার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে যখন খুশি দেখা করা যায়। মনীষা বাড়িতে না থাকলে আমি ওপরে উঠে যেতে পারি।

—দাদাবাবু বাড়িতে আছে তো?

—কোন দাদাবাবু? ছোড়দাদাবাবু আছেন?

চাকরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম। অরুণ আর সুজয়ার সঙ্গে গল্প করতে করতে যদি মনীষা এসে পড়ে —তা হলে কোনো একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সেদিন সন্ধেবেলা ও বৌবাজারের মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল কেন? কোথা থেকে আসছিল বা কোথায় যাচ্ছিল? মনীষা সম্পর্কে ওদের বাড়িতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, ও কখন কোথায় যাবে বা কখন ফিরবে, সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে না। এক একটি মেয়ে থাকে এ'রকম, যাদের সম্পর্কে অভিভাবকরা শাসন করতেও সাহস পান না। নিজেরা ছোট হয়ে যাবেন, এই ভয়ে। মনীষা কোনদিন কোনো অপমানজনক বা মুখ নিচু হওয়ার মতন কাজ করবে, একথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

মনীষা যদি জিজ্ঞেস করে, আমি কেন সেদিন ওকে দেখেও ট্যাক্সি থামাইনি, কিংবা চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম? কি উত্তর দেবো? এসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায় না। তখন সেই মুহূর্তে, যা মনে আসবে, কিংবা সবচেয়ে সহজ উত্তর যেটা, সেটা বলাই তো ভালো। জানি না। মনীষা, কেন আমি সেদিন ও'রকম করেছিলাম, আমি নিজেই জানি না।

—কি, খবর সব ভালো তো?

আমি দেয়াল ঘেঁষে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়ালাম। লাজুক মাথা হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ, ভালো।

মনীষার বাবা। ওঁকে দেখলেই কেন যেন আমি বেশ আড়ষ্ট হয়ে যাই। অথচ কোনো কারণ নেই।

—লেখা-টেখা চলছে কি রকম? সেদিন কালীশঙ্করবাবু বলছিলেন তোমার কথা।

মনীষার বাবা আমার কোনো লেখা কোনোদিন পড়বেন, এটা আশা করাই অদ্ভুত। আগেকার দিনে যাকে বলতো 'বাতুলতা'। উনি খুব ব্যস্ত লোক, এসব ছেলেমানুষী করার সময় কোথায়? তবে কিছু কিছু লেখকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে। যে-সব লেখক প্রৌঢ়ত্ব ও খ্যাতির শিখরে ওঠার পর লেখা-টেখা ছেড়ে নানান কমিটির মেম্বার

হন তাঁদের সঙ্গে ওঁর জানাশোনা। মনীষার বাবা চারুমোহন মুখার্জিও ঐ সব সাহিত্যিকের কাছ থেকেই বোধহয় শুনেছেন আমার লেখাটেখার কথা। প্রশংসা কি আর শুনেছেন, নিন্দে শোনাই স্বাভাবিক—কারণ আমার লেখা-টেখা তো নিন্দেরই যোগ্য।

—এই একটু আধটু।

—না, লেখো, বেশি করে লেখো। একটু আধটু কেন—তোমার বয়েসে রবীন্দ্রনাথ কত লিখেছিলেন জানো ?

এসব কথার কোন উত্তর দিতে নেই। মাথা নিচু করে শুনতে হয়। হাতের নোখ খুঁটলে কিংবা কান চুলকোলে আরও ভালো দেখায়।

—লেখা ছাড়া আর কি করছো ? তুমি নাকি রিসার্চ করবে শুনছিলাম ?

কার কাছ থেকে শুনলেন কে জানে ! বললাম, আজ্ঞে না, রিসার্চ করছি না। এমনিই একটা সরকারী অফিসে—

ডব্লু. বি. সি. এস ? আই এ এস দিলে না কেন ?

—দিয়েছি। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি।

মিথ্যে কথা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কি করবো। আই. এ. এস. দূরের কথা, ডব্লু. বি. সি. এস দেবার কথাও আমি কখনো ভাবিনি। মনীষার বাবার ভুলো মন, পরে নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন।

—হেমন্তর কি খবর ? অনেকদিন দেখিনি।

—ভালোই আছে।

—ও ফিলিপস্ কম্পানিতে আছে না ? ভালো পোস্টে ঢুকেছে শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—বেশ ভালো। লেখো, আরও বেশি করে লেখো। তোমার বয়েসে রবীন্দ্রনাথ—

মনীষার বাবা নেমে গেলে আমি আবার আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। আমার হাত ও পা একটু একটু কাঁপছে। কে যেন আমাকে এইমাত্র ঠাস করে একটা চড় মেরেছে। মনীষার বাবা কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। অথচ আজ কি যেন একটা প্রবল

অস্বস্তি—মনে হলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ তুলনাটা আমাকে বেশি অপমানিত করেছে।

তোয়ালে হাতে নিয়ে ঊষাদি বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে বললেন, কি রে, তোকে অনেকদিন দেখি না কেন?

—বাঃ, তোমাকেই তো দেখতে পাই না। তুমি কত ব্যস্ত থাকো—

১৭ বছর বয়েসে জেলে গিয়েছিলেন ঊষাদি। বিনয়দাকে ভালোবাসতেন, বিনয়দা যা করতেন ঊষাদিও তাই। ওঁর বাবা বেলের ব্যবস্থা করে ঊষাদিকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিলেন। ঊষাদি আসতে রাজি হননি। মাঝখানে তো বছর চারেক ঊষাদি বাড়িতে না থেকে হোস্টেলে থাকতেন। বিনয়দা মারা যাবার পর ঊষাদি অন্য কারুকে বিয়ে করতে চাননি। সমাজ সেবার কাজে মন দিয়েছেন। এখন একটু মোটা হয়ে গেলেও ঊষাদি একসময় মনীষার চেয়েও সুন্দরী ছিলেন। কারুর জীবনে একটা কোনো কঠিন প্রতিজ্ঞা আছে, এটা জানলে খুব ভালো লাগে। ঊষাদির কিছু প্রভাব আছে মনীষার ওপরে। মনীষা কখনো বিদেশি সেন্ট মাখে না। বাঙ্গালোরে প্রথম হাতঘড়ি তৈরি হবার পর মনীষা ঘড়ি হাতে দিয়েছে।

ঊষাদি বললেন, এই শোন, তোকে খুঁজছিলাম। আমাদের একটা পত্রিকা বেরুচ্ছে, তুই একটু লেখা-টেখা দিয়ে সাহায্য কর না। 'কুটীর শিল্পে মেয়েদের স্থান' এই বিষয়ে একটা লেখা তৈরী করে দিবি, আমি তোকে মেটিরিয়াল দেবো—

ঐ সব লেখা আমার সাধ্যে কুলোয় না। বাংলায় আমি চিরকাল কম নম্বর পেয়েছি, রচনা লিখতে পারি না বলে। কিন্তু ঊষাদির জন্য কষ্ট করে চেষ্টা করা যায়। বললাম, হ্যাঁ দেবো। একদিন দেখা করবো তোমাদের অফিসে।

—আসিস কিন্তু ঠিক। সামনের সপ্তাহেই একদিন আয় না—

ঊষাদির অফিসে কোনোদিনই যাওয়া হয়নি অবশ্য। কুটীর শিল্প বিষয়ক রচনা লেখার কথা আর মনেও পড়েনি আমার। আবার ঊষাদির সঙ্গে দেখা হলে বকুনি খাবো। ঊষাদির কাছে বকুনি

খেতেও আমার ভালো লাগে।

সুজয়া ওর ঘরের ছবি মোছামুছি করছে। কোমরে আঁচল গুঁজে চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়ছে ওর ঠাকুমার ফটো থেকে।

চৌকাঠে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই সুজয়া, অরুণ কোথায় ?

—বসুন, ও আছে।

—বসুন মানে, কোথায় বসবো ? সব ধুলোগুলো আমার গায়ে ফেলবে ?

সুজয়া হেসে বললো, তাই তো, সাজপোশাক যদি নষ্ট হয়ে যায়! ঐ দিকটায় বসুন—ওখানে লাগবে না।

—অরুণ কোথায় ?

—ছাদে।

—সেখানে কি করছে ?

—ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

—বাঃ। বুড়ো বয়সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কি ?

—দেখুন না কাণ্ড! পরশুদিন বিশ্বকর্মা পুজো ছিল তো বাড়িতে অনেকগুলো ঘুড়ি এসে পড়েছে। আজ শনিবার তাই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই বললো, ঘুড়িগুলো নষ্ট করে কি হবে, উড়িয়ে আসি। ও আর মধুবন মিলে ঘুড়ি ওড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বসুন, ডেকে পাঠাচ্ছি ওকে।

তবে যে একতলায় চাকরের মুখে শুনলাম, মনীষা বেরিয়ে গেছে। চাকর ভুল বলছে, না সুজয়া জানে না ? যদি মনীষা ছাদে থাকে, আমি এক্ষুনি সেখানে—

—ডাকতে হবে না। আমিও ছাদে যাচ্ছি।

কত সহজে কত কথা ভুলে যাই। অরুণ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে শুনে আমি অবাক হলাম। অথচ আমার নিজেরই কি অসম্ভব নেশা ছিল ঘুড়ি ওড়াবার। অরুণ আর আমি ভালো মাঞ্জা কিনবার জন্য শ্যামবাজারে নাজির সাহেবের দোকানে চলে যেতাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখলে থমকে যেতাম, কোনটা

কাটলো, না দেখে যেতে পারতাম না।

একটা পাজামা পরা, খালি গায়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অরুণ। সারা গায়ে ঘাম। মনীষা নেই। মনীষার দেখা না পাওয়াই যেন আমার নিয়তি। ছাদে এই প্রবল হওয়ার মধ্যে ও কি আঁচল উড়িয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না? অরুণ আমাকে দেখেই বললো, এসেছিস, লাটাইটা ধর তো। অনেকদিন অভ্যেস নেই।

—আরে লাট ছাড়, লাট ছাড়! ঐ লাল চাঁদিয়ালটা তোকে তলায় পড়ে টানতে আসছে।

আসুক না,—বাড়ুক আগে, আর একটু বাড়ুক।

—দে, দে, আমায় দে। আমি ওটাকে এক্ষুনি টেনে দিচ্ছি।

—দাঁড়া, আমি প্যাঁচটা খেলে নি এর পরেরটা তুই খেলবি। মধুবন এতক্ষণ লাটাই ধরেছিল, হঠাৎ চলে গেল।

আমরা দুই বন্ধু তারপর অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ানোতে মগ্ন হয়ে গেলাম। লাল চাঁদিয়ালটা সাংঘাতিক খেলছে, আমাদের তিনখানা ঘুড়ি ভো কাট্টা করে দিল। আমরা ওটাকে কাটার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

অনেকদিন অভ্যেস নেই, মাঞ্জা দেওয়া সুতো জোরে টানতে গিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, বেশিক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যে সব প্যাঁচ আগে কত সহজ ছিল, এখন সেগুলো খেলতেই পারছি না। অন্য ঘুড়ি এসে কুচ করে কেটে দিচ্ছে। যে লাল চাঁদিয়াল ঘুড়িটা আমাদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল—একটু পরে টের পেলাম সেটা ওড়াচ্ছে একটা চোদ্দ বছরের ছেলে। ঐ বয়সে অরুণ আর আমিও পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে ফাঁক করে দিতাম।

বিকেলের আলো নিভে গেলেও আমাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা কমেনি, হঠাৎ বৃষ্টি এলো। দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল একেবারে। ঘুড়ি-সুতো-লাটাই ফেলে রেখে দৌড়োলাম; অরুণ বললো, আয় এই ঘরটায় ঢুকে পড়।

তিনতলায় সিঁড়ির দু'পাশে দু'টো ঘর, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম একটায়। ছোট কিন্তু ছিমছাম সাজানো ঘরখানা, এক পাশে

একটা পুরনো আমলের ভারী ভারী পায়াওয়ালা খাট, তার পাশে ছোট্ট একটা টিপয়, অন্যদিকে ড্রেসিং টেব্‌ল, স্টীলের আলমারি—আর দু'খানা কাচের গা আলমারি ভর্তি বই। লাল ঘরের মেঝে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার—মাঝখানে একটা কালো বড় সাইজের বৃত্ত, আগেকার অনেক বাড়িতে এ'রকম দেখা যেত। চেয়ার নেই! অরুণ বললো, আয়, এই বিছানায় বোস। মাথাটা মুছবি, দেখি তোয়ালে-টোয়ালে আবার কোথায় রেখেছে।

—এই ঘরে কে থাকে রে?

তোয়ালে খুঁজে না পেয়ে অরুণ বললো, এটা মধুবনের ঘর। কোথায় যে কি রাখে—কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তোয়ালে-টোয়ালে নেই একটাও—

আমি বললাম, ঘরখানা তো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। বেশ ঝক্‌ঝকে—

—মধুবন এ সব করে নাকি? ছাই! এসব তো কালোর মা করে।

—কালোর মা কে?

—দেখিস নি? আমাদের যে রান্না করে! ও তো জন্ম থেকে মধুবনকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—মধুবনকে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। এত বয়েস হয়ে গেছে—বাবা বলেছিল ওকে একসঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দেবে—নিজের ছেলের কাছে গিয়ে থাকা—তা ও কিছুতেই যাবে না!

আমি মনে মনে কালোর মা-কে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনীষাকে সে ভালোবাসে, সে আমারও প্রিয়।

অরুণ বললো দাঁড়া দেখি, দিদির ঘরে তোয়ালে পাওয়া যায় কি না। সুজয়া কি করছে নীচে, কফি-টফি বানাচ্ছে?

—তোমার বউ কি করছে, আমি তা কি করে জানবো?

—এই বৃষ্টির মধ্যে মুড়ি তেলেভাজা হলে বেশ জমতো। খাবি?

—খাবো। কাঁচালঙ্কা চাই সঙ্গে।

সিঁড়ির ওপাশের ঘর থেকে অরুণ একটা তোয়ালে নিয়ে এলো।

হাঁক ছাড়লো সুজয়াকে।

মাথা মোছার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মনীষা এই ঘরে একলা একলা থাকে? ওর ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন? ও তো অনেক কম বয়েস থেকেই একা একা শোয়। ওদিকের ঘরটায় দিদি থাকে—কিন্তু দিদি অনেক সময় টুরে গেলে—তিনতলায় ও তখন একলা।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিই আমি বোকার মতন। সত্যি তো, আজকাল কোনো মেয়ে একলা ঘরে শুতে ভয় পায় নাকি? বরং বাড়িতে বেশি জায়গা থাকলে সবাই সেটা পছন্দ করে। কিন্তু মনীষা সম্পর্কে এরকম ছোটোখাটো তথ্য জানতে বেশ ভালো লাগছে আমার। এতদিন এ বাড়িতে আসছি, অথচ মনীষা কোন ঘরে শোয় সেটা আমি জানতুম না। এই ঘরটায় আমি অবশ্য আগে এসেছি বার দু'য়েক তখন ঘরটার চেহারা অন্যরকম ছিল। প্রথমবার এসেছিলাম অরুণের বিয়েতে। এই ঘরটায় কনেকে বসানো হয়েছিল বৌভাতের দিন—অন্যরকম সাজানো ছিল। আর একবার দোলের দিন এই ঘরে খুব গানবাজনা হলো—খুব দুর্দান্ত রঙের খেলা হয়েছিল সেবার—আমি মনীষার···

সুজয়া আসছে না, অরুণ আবার হাঁক মারতে গেল। খাট থেকে নেমে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম ঘরটা। তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষকের চোখে আমি দেখে নিতে লাগলাম এ ঘরের প্রতিটি আসবাবের অবস্থান। যেন সব কিছুই ঠিকঠাক মুখস্থ করে নিতে হবে, কোনো ভুল না হয়। অথচ কোনোই মানে হয় না। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। যাতে এর পরে চোখ বুজলেই ঘরটা স্পষ্ট দেখতে পারি। দেয়ালের দাগগুলো পর্যন্ত।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা চিঠির প্যাড। মনীষা আমাকে কোনোদিন চিঠি লেখেনি। আমিও লিখিনি। আলমারির পাশে একটা ছোট্ট দেয়াল র‍্যাক, তাতে ঝুলছে মনীষার হাউস-কোট। গা-আলমারির বইগুলোতে চোখ বোলালাম। একটা ছোট্ট বারান্দা রয়েছে রাস্তার দিকে। কয়েকটা টব সাজানো, রজনীগন্ধাগুলো দুলছে বৃষ্টির ছাট লেগে। এবং বিনা কারণে সেখানে রয়েছে

বাচ্চাদের একটা তিনচাকার সাইকেল। এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা নেই। মনীষাই এ বাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান, সাইকেলটা বোধহয় মনীষারই ছেলেবেলার। অত্যন্ত মায়ার সঙ্গে আমি সাইকেলটার গায়ে হাত বুলোলাম।

অরুণ তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলছে, আমি বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। আলমারিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে র‍্যাকে ঝোলানো মনীষার হাউস-কোটটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শুয়ে পড়ার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠে মনীষা ওটা গায়ে দেয়। লাল ও খয়েরি রঙের লতাপাতা আঁকা সুন্দর ডিজাইন। হাউস-কোটটার ওপর হাত রেখে, কিছু না ভেবেই আমি মুখ এগিয়ে নিয়ে বুকের কাছাকাছি জায়গায় চুমু খেলাম আলতোভাবে।

পরক্ষণেই আমার মনে হলো, এই যে ব্যাপারটা আমি করলাম, নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের বইতে এ ব্যাপারটারও কিছু একটা নাম আছে। ভারীগোছের ল্যাটিন কোনো নাম থাকাও বিচিত্র নয়। এবং নির্ঘাৎ সেখানে অস্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে অনেক কচকচি। আমি কি অস্বাভাবিক মানুষ?

তেলেভাজা এসে পৌঁছোবার আগেই সুজয়া কফি বানিয়ে ফেলেছে। আগে নিয়ে এসেছে কফি। আমি বললাম, এঃ, আগেই কফি এসে গেল? মুড়ি খেয়ে তারপর আবার যে কফি খেতে ইচ্ছে করবে?

সুজয়া বললো, ইস, আমি আবার কফি বানাবো বুঝি? ওসব চলবে না।

—আজকাল তো ইনস্ট্যাণ্ট কফির রাজত্ব। কতক্ষণই বা লাগবে?

—তাহলে নীচে চলুন। আমি কতবার নীচে ওপরে ওঠানামা করবো!

অরুণ বললে, বেশ তো বসেছি, আবার ওঠাউঠি! কালোর মাকে বলো না দিয়ে যাবে।

সুজয়া বললো, কালোর মা বুড়ো মানুষ, তাকে এত সব বলতে আমার লজ্জা করে।

আমি মনে মনে সুজয়াকেও একটা ধন্যবাদ দিলাম। কালোর মা মনীষাকে ভালোবাসে, তাকে দিয়ে বেশি কাজ করানো উচিত নয়।

অরুণ বললো, তাহলে তুমিই যাবে। একটু এক্সারসাইজ করো, গুড ফর ইয়োর হেলথ! তোমাদের বাড়িতে সবার মোটার ধাত।

—মোটেই না! আর তুমি বসে বসে সব সময় আলস্য করবে। আমিই তো সব কিছু করি। তুমি তো কিছু করো না।

অরুণ বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললো, তুমিই সব কিছু করো? অফিসে গিয়ে আমাকে যে ব্রেন খাটাতে হয়, সেটা বুঝি কিছুই না? কিংবা ধরো রাত্তির বেলা—তখনও তুমিই সব কিছু···

সুজয়া রেগে মারতে গেল অরুণকে। অরুণ হাসিমুখে মার খাচ্ছে। এই ধরনের মুখ-আলগা রসিকতা ও বেশ পছন্দ করে।

মুড়ি ফুরিয়ে যাবার পর অরুণ বললো, ঠিক জমলো না, আর একটা কিছু হলে হতো। বৃষ্টিটা যে-রকম জমিয়ে নেমেছে।

এ বাড়িতে আমি এসেছি প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা আগে। মনে মনে খুব আশা করছিলাম মনীষা ফিরে আসবে। হয়তো বৃষ্টির জন্যই কোথাও আটকে গেছে।

অরুণ জিজ্ঞেস করলো, হেমন্ত কোথায় রে? অনেকদিন দেখি না।

—অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল দিন দুয়েকের জন্য। আজই বোধহয় ফেরার কথা।

হেমন্তটা থাকলে বেশ জমতো। একটু হুইস্কি-টুইস্কি খেলে মন্দ হতো না। হেমন্তকে টেলিফোন করে দেখবো।

সুজয়া বললো, বাড়িতে থাকলেও এই বৃষ্টির মধ্যে আসবে কি করে?

অরুণ বললো, তুমি এখনও হেমন্তকে চিনতে পারোনি! বৃষ্টি আর কি, আকাশ থেকে বোমা পড়লেও হেমন্ত তার মাঝখান দিয়ে চলে আসতে পারে।

টেলিফোনে পাওয়া গেল হেমন্তকে। ও তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, টেলিফোন পেয়েই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো। সেই

ট্যাক্সি থামিয়ে রেখেই নিতে এলো আমাদের।

সুজয়াকেও জোর করে নিয়ে চললো সঙ্গে, সুজয়ার কোনো আপত্তিই টিকলো না। এবং বাড়ি থেকে বেরুবার আগে হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, মনীষা কোথায়? ওকেও ডাকো, চলুক আমাদের সঙ্গে। গঙ্গার ধারে আড্ডা দেবো আজ।

সুজয়া বললো, মধুবন বাড়িতে নেই।

—কোথায় গেছে? যেখানে আছে, চলো, সেখান থেকে ওকে আমরা তুলে নিচ্ছি।

—কোথায় গেছে বলে যায়নি তো—

হেমন্ত বিস্মিত ভুরু তুলে বললো, মনীষা আজকাল কোথায় যায় বলো তো? ওর তো দেখাই পাই না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বৌবাজারের মোড়ে একলা দাঁড়িয়েছিল—

আমি এতক্ষণ এসেছি, একবারও মনীষার কথা জিজ্ঞেস করিনি। অথচ হেমন্ত কত অবলীলাক্রমে। হেমন্ত পারে।

হুইস্কি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল অরুণের। আমারও। সুজয়ার ঘোরতর আপত্তি। অরুণ নানারকমভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সুজয়া ডিকটেটর। বৃষ্টি থেমে গেছে, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, এখন সে কোনো বার-রেস্টুরেন্টের বদ্ধ আবহাওয়ায় বসে থাকতে চায় না। কেন, গঙ্গার পাড়ে আড্ডা দেওয়া খারাপ কি? হেমন্ত চট করে সুজয়ার দলে চলে গেল। বিশুদ্ধ হাওয়ার দিকেই তার ঝোঁক।

কোনো কোনো রাস্তায় জল জমে গেছে। সেসব এড়িয়ে আমরা গঙ্গার ধারে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আবছা নদীর দৃশ্য দেখতে সত্যি মন্দ লাগে না। কথায় হাসিতে গানের টুকরোয় হেমন্ত সুজয়াকে এমন ভুলিয়ে রাখলো যে কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তিনজন যুবকের মধ্যে মধ্যমণি নারী হিসাবে সুজয়া বেশ খুশি ও অহংকারী হয়ে উঠলো। হেমন্তর তরতাজা স্বভাবের জন্য ওর সামনে কেউ বেশিক্ষণ মুখ গোমড়া করে থাকতে পারে না। হেমন্তর সতেজ উন্নত হৃদয় পৃথিবীকে আনন্দময় দেখতে চায়।

কথাবার্তা যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন হেমন্ত পকেট থেকে

হুইস্কির পাঁইট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে, চুমুক দে!

কখন যে হেমন্ত এটা জোগাড় করেছে, আমিও বুঝতে পারিনি। অরুণও যেমন অবাক তেমন খুশি। সুজয়া ভুরু তুলেছে, হেমন্ত বললো, আর তুমি আপত্তি করতে পারবে না। কথা রেখেছি, গঙ্গার হাওয়া ঠিকই খাচ্ছি। তবে বুঝলে না, এত টাটকা হাওয়া, নিট তো খাওয়া যায় না, তাই একটু পাঞ্চ করে—তুমি একটু খাবে নাকি?

মুখ ঘুরিয়ে সুজয়া বললো, হ্যাঁ, তারপর আর আমার বাকি থাকে কি? বাড়ির বউ গঙ্গার ধারে এসে স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে মদ খাচ্ছে।

—আ-হা-হা মদ কথাটা উচ্চারণ করতে নেই মেয়েদের, খারাপ শোনায়। ইংরিজি করে বলো, ড্রিংকস, বেশ ভদ্র লাগবে। গেলাস এনে দেবো তোমার জন্যে?

—থাক হয়েছে, হয়েছে।

আমি জানি, হেমন্ত এই গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়েও অবিলম্বে গেলাস জোগাড় করে ফেলতে পারে। ওর এ'রকম ক্ষমতা আছে। 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে' একটা চরিত্র আছে, কাটস্কিন্স্কি, তার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে হেমন্তকে দেখলে।

সুজয়াকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তার মধ্যেই অবশ্য আমাদের বোতল প্রায় শেষ। হেমন্ত বললো, তুমি খেলে না, কিন্তু মনীষা থাকলে ঠিক খেতো।

সুজয়া একটু ব্যস্ত হয়ে বললো, মধুবনকে এসব খাইয়েছো নাকি?

—তা খাওয়াইনি। মনীষার দেখাই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ওকে বললে ঠিক একবার অন্তত খেয়ে দেখতো। ওর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিট আছে।

অরুণ বললো, আমারই বোন তো। হবে না?

সুজয়া বললো, থাক হয়েছে, হয়েছে। তুমি নিজে তো গেছই, আবার বোনটাকেও…মধুবন কক্ষনো এই ধরনের কাজ

করবে না।

—আমি গেছি মানে কি? আমি বখে গেছি। দু'মাস বাদে এই প্রথম টাচ করলাম! তুমিও তো খেয়েছো, খাওনি? অফিসের পার্টিতে তুমি যে সরবৎ খেলে—সেটা কি? জিন অ্যান্ড লাইম মেশানো—। এই সুনীল, লাস্ট চুমুকটা আমাকে দিস—ঘুড়ি উড়িয়ে খুব পরিশ্রম গেছে…

…রাস্তার দিকের বারান্দার দরজাটা খুলে আমি মনীষার ঘরে ঢুকলাম। অন্ধকারে পায়ে কিসের একটা ধাক্কা লাগলো। একটু আগে বারান্দায় তিন চাকার সাইকেলটায় একবার ধাক্কা খেয়েছি। আলোর সুইচটা কোনদিকে সেটা সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্য করা হয়নি। এটা একটা সাংঘাতিক ভুল।

দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সুইচ খুঁজতে লাগলাম। সাধারণত দরজার পাশেই থাকার কথা। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে খানিকটা —আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি বিছানায় শুয়ে আছে মনীষা, ওদিকে পাশফেরা।

আলো কি জ্বালা উচিত? অন্ধকারে আমার আসার অস্তিত্ব টের পেয়ে মনীষা যদি চেঁচিয়ে ওঠে? আলো জ্বাললেও এই গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে মনীষা চেঁচিয়ে উঠবে না?

সাবধানে পা ফেলে ফেলে মনীষার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালাম। টিপয়ের ওপর এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া। কি সুন্দর লেসের কাজ করা ঢাকনা। কিছু না ভেবে-চিন্তে আমি গেলাসের জলটা খেয়ে ফেললাম। খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ায় আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম একটা। দেশলাইয়ের কাঠিটা কোথায় ফেলবো? মেয়েদের ঘরে অ্যাশট্রে আশা করা যায় না, জানলার কাছে গিয়ে বার বার ছাই ফেলে আসতে হবে।

এখন আর নিজেকে চোর চোর মনে হচ্ছে না। চোর কখনো সিগারেট ধরায় না। এখন সব কিছুই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। নিশ্বাসের সঙ্গে একটু একটু দুলছে মনীষার শরীর। খাটের

পাশে বেড সুইচ—হঠাৎ আলো জ্বালার আর কোনো অসুবিধে নেই।

মেয়েদের ঘুম সাধারণত খুব গাঢ় হয় না। মনীষা কি হঠাৎ জেগে উঠবে? ঘুমন্ত মনীষাকে আমি কখনো দেখিনি। দেখিনি ওর নিমিলিত চোখ। বস্তুত, এত কাছ থেকে এত নিবিষ্ট ভাবে ওকে কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।

মন, চেয়ে দ্যাখ, এর নাম নারী। রক্তমাংসের এই এক মহা শক্তিশালী চুম্বক। এরই নাম মায়ার খনি। এরই নাম মহামায়া। পাখির ডানার মতন ঐ দুই ভুরু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, নিশ্বাসে দুলে ওঠা সুঠাম দুই-বুক, কোমল আঙুল, নর্তকীর মতন কটিরেখা, জঙ্ঘার ডোল, মা-লক্ষ্মীর মতন দুটি পায়ের পাতা—এ কোনরকম সৌন্দর্যের আধার? এ কি শুধু নির্নিমেষে দেখার, না ছুঁয়ে ছেনে ভোগ করার? ফুল দেখলে গন্ধ শুঁকি, খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না। নদী দেখলে স্নান করার বাসনা হয়। এ কোন ধরনের সৌন্দর্য? ফুল না নদী?

জানালা দিয়ে সিগারেটটা ফেলে এসে আমি খুব আলতোভাবে খাটের ওপর বসলাম। আমার দুঃসাহস দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। মনীষা জাগলো না। আরও সাহস সঞ্চয় করে আমি হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। মনীষা তখনো জাগেনি। দেখতে যখন চাই তখন পরিপূর্ণ আলোয় দেখা ভালো।

মনীষার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির ছায়া। কোনো সুখের স্বপ্ন দেখছে? এর আগে অনেকবার আমি মনীষার হাস্যময় মুখের কথা বলেছি। সেটা আমার মুদ্রাদোষ নয়—মনীষার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে ওর চাপা হাসিমাখা মুখ। গম্ভীর কিংবা মনমরা অবস্থায় ওকে আমি কখনো দেখিনি। আমি নিজেও ওকে কখনো বিষণ্ণ করে দিতে পারিনি। ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে। আজ কি আমি ওকে বিষণ্ণ করে দেবো?

পাতলা রাত্রিবাস পরে শুয়ে আছে মনীষা। কিন্তু আমার মনে কোনো অসভ্য চিন্তা জাগলো না। এজন্য আমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য।

উরুর কাছ থেকে আলতোভাবে ওর রাত্রিবাসটা সরিয়ে দেবার লোভ কি আমার জাগতে পারতো না? আমি তো শুধু পুরুষ নই। তাছাড়া সৌন্দর্য দর্শনে কি কোনো সীমারেখা টানা যায়? কিন্তু মনীষার চরিত্রটাই এরকম, ওর কাছে এলে কোনোরকম অসমীচীন বা কুৎসিত চিন্তা মাথায় আসে না। ওর ঘুমন্ত শরীরেও সেই চরিত্রটা জেগে আছে। একটা হাত বুকের কাছে, একটা হাত বিছানায় ছড়ানো। গলায় হার নেই, হাতে একটাও চুড়ি নেই। এ রকম নিরলঙ্কার নারী আমি দেখিনি। গোছা গোছা চুল ছড়িয়ে আছে বালিশ জুড়ে। পায়ের তলা দুটোও কি পরিষ্কার, একটুও ময়লা নেই।

ওর চুলের ওপর হাত রাখতে যেতেই মনীষা একটু নড়ে উঠলো। দিশে হারিয়ে আমি তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম নিথরভাবে। মনীষা আবার নড়ে উঠতেই আমি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালাম দেয়ালে ঘেঁষে। মানুষের চুল কি এত সেনসেটিভ যে সামান্য ছোঁয়াতেই টের পেয়ে যাবে?

মনীষা পাশ ফিরলো, হাত বাড়ালো জলের গেলাসের দিকে। ও জানে না, চোর এসে জল খেয়ে নিয়েছে। খুট করে শব্দ হয়ে আলো জ্বলে উঠলো। তাও আমাকে দেখতে পায়নি।

চোরেরা যা করে না, সে রকম একটা কিছু আমার করা উচিত। পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমি শব্দ করে দেশলাই কাটি জ্বালালাম।

মনীষা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। সদ্য ঘুম ভাঙা মুখে চড়া আলো পড়ার জন্য চোখ কুঁচকে গেছে, সেইভাবে দেখছে আমাকে। বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে স্বপ্ন। আমি মৃদু গলায় ডাকলাম, মনীষা—।

এবার ধড়মড় করে উঠে বসে পায়ের কাছ থেকে একটা চাদর টেনে গায়ে জড়ালো। বললো, একি?

হঠাৎ খুব বেশি চিৎকার করে উঠবে, কিংবা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে—মনীষা সে রকম মেয়ে নয়। তবু আমার একটু একটু আশঙ্কা ছিল। ব্যাপারটা এত সহজ হবে আশা করি নি। এরপর

মনীষা আর যাই করুক চেঁচিয়ে বাড়ির লোক জড়ো করবে না।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বসলাম, মনীষা রাগ করো না—

তখনো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঘোর লাগা চোখ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আস্তে আস্তে বললো, তুমি কি করে এলে?

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, হঠাৎ খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমাকে পুলিশে তাড়া করেছিল—আমার কোনো দোষ নেই।—অবস্থাটা আগে শোনো—

জানি, খুবই অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে। বটতলার উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনা থাকে। আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প-উপন্যাসে লিখতে পারি, কিন্তু নিজে কোনো সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়লে, কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ বানাতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, ভীষণভাবে আমার বুক কাঁপছিল। আমি নিজেই সেই দুপদাপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মনীষা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করে এলে?

—পাইপ বেয়ে। বারান্দার পাশেই একটা পাইপ আছে, অতি-কষ্টে পা পিছলে অরে একটু হলে পড়ে মরছিলাম—

এই বর্ণনাটা আরও খারাপ। আমি ঠিক পাইপ বেয়ে ওঠা ছেলে ছোকরার টাইপ নই। সত্যিকারের পুলিশ কোনোদিন তাড়া করলেও, প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি কোনোদিন তিনতলা বাড়ির বারান্দায় পাইপ বেয়ে উঠতে পারবো না। শারীরিক সামর্থ্য ছাড়াও আমার লজ্জা করবে।

মনীষার মুখ দেখে মনে হলো না আমার একটা কথাও বিশ্বাস করেছে। করতলে রাখলো চিবুক। চোখ আমার চোখে।

সপ্রতিভ হবার জন্য আমি বললাম, রাস্তার দিকে বারান্দার এই দরজাটা খুলে শুয়ো না কখনো। অন্য লোকও তো উঠে আসতে পারে। যদি কোন চোর ডাকাত হতো—

মনীষা শান্তভাবে বললো, দরজাটা বন্ধই থাকে—

—আজ ছিল না।

—হ্যাঁ, ছিল।

—না, ছিল না।

—নিশ্চয়ই ছিল। আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছি।

—আজ করোনি। ভুলে গেছ।

—আমার ভুল হয় না।

বেশ একটা তর্ক শুরু হয়ে গেল। মাঝ রাত্তিরে এই পরিস্থিতিতে আর সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু একটা দরজা বন্ধ ছিল কি ছিল না —তাই নিয়ে তর্ক করার মধ্যে একটা মজা আছে।

আমি জোরের সঙ্গে বললাম, দরজা যদি বন্ধই থাকলো—তাহলে আমি ঢুকলাম কি করে? ভূত হয়ে সূক্ষ্ম শরীরে তো ঢুকিনি?

—কি করে বুঝবো। হতেও পারো ভূত।

কাছে এগিয়ে হাতটা বাড়িয়ে বললাম, ছুঁয়ে দেখো, ভূত কি না!

ছুঁয়ে দেখলো না, শান্ত গলায় বললো, এসব কি হচ্ছে কি, রাত দুপুরে?

—কি করবো, রাত দুপুরে ছাড়া তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

—ইস, আমার দেখা পাবার জন্য উনি একেবারে পাগল!

—মনীষা, প্লীজ, জোরে কথা বলো না! পাশের ঘরে উষাদি আছেন না?

মনীষার ভুরুতে ও ঠোঁটে এবার সেই চেনা পাতলা হাসিটা ফিরে এলো। বললো, দিদিকে ডাকবো? ডেকে বলবো যে আমার ঘরে একটা ভূত এসেছে দেখে যাও?

আমি বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললাম, যদি ইচ্ছে হয়, ডাকতে পারো!

—তারপর তুমি কি আবার ঐ পাইপ বেয়ে নামার চেষ্টা করবে নাকি?

—দরকার হলে তাই করতে হবে।

—কি হয়েছে, সত্যি করে বলো তো?

নির্ভয়ে খাটের উপর বসলাম। মনীষার হাত ছুঁয়ে বললাম,

তোমাকে দেখতে এসেছি।

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে মনীষা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, আমার ভয় করছে।

মনীষার এই কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাঁটুতে ওর থুতনি তখনও ঠেকানো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বললে? মনীষা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললো, আমার ভয় করছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ঘরের মধ্যে একজন মানুষ দেখে ভয় পায়নি যে মেয়ে, এখন তার ভয় পাবার মানে কি? মনীষা আমাকে চেনে, আমি তো বিপদজনক মানুষ নই।

—কোনো ভয় নেই। সত্যি বলছি, আমার কাছ থেকে কোনো ভয় নেই।

—আমার জন্য নয়। আমি একটা সামান্য মেয়ে তার জন্য এ রকম পাগলামি করা কি তোমার মানায়? তোমার একটা মান-সম্মান আছে, এইরকম ছেলেমানুষী করার জন্য যদি তোমার সম্মান নষ্ট হয়—

মনীষার এই ধরনের কথায় আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। মনীষা কোনোদিন আমাকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু বলেনি। মনীষা বললো, আমার সম্মান আছে! কিসের সম্মান? সমস্ত পৃথিবী আমার দিকে ছি ছি করলেও আমার কিছু আসে যায় না। তবে প্রত্যেক পুরুষই চায় তার প্রিয় নারীর কাছে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে। আমি বললাম, আমি ওসব মান-সম্মান গ্রাহ্য করি না। আমি তো লেখক হতে চাই, আমার অনেক কিছু দেখা দরকার অনেক কিছু জানা দরকার। গভীর রাত্রে একটি মেয়ের ঘরে ঢুকলে কি রকম লাগে আমি সেটা দেখতে এসেছিলাম।

—দেখা তো হয়ে গেছে। এবার যাও।

—না, দেখা হয়নি।

—আবার কি দেখবে?

—তোমাকে।

—আমাকে? কেন, আমাকে তুমি আগে কখনো দেখোনি?

—না, দেখিনি। মনীষা আমি তোমাকে একটুও চিনি না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে দু' চোখ ভরে দেখতে চাই।

—ছেলেমানুষী করো না! মেঝেতে যে সিগারেটের ছাই ফেলছো, কাল সকালে এসে কেউ দেখলে কি ভাববে?

—ওঃ হো! আমি যাবার সময় পরিষ্কার করে দিয়ে যাবো।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে দিলাম জানালা দিয়ে। কিন্তু সচরাচর যা হয় কিছুতেই ওরা যেতে চায় না, জানালার শিকে লেগে ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেটাকে আবার ফেলতে হলো। পরিষ্কার করলাম মেঝের ছাই।

কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে হঠাৎ বদলে গেলাম আমি। কোথা থেকে বুক মোচড়ানো আবেগ এসে আমাকে পেয়ে বসলো। মনে হলো, আমার জীবনটা নেহাৎ অকিঞ্চিতকর, উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ। বিছানার ওপর বসে থাকা ঐ যুবতীটির মাধুর্য আমাকে নতুন জীবন দিতে পারে।

খাটের কাছে ফিরে এসে মনীষার কাঁধ চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, মধুবন, তোমাকে না দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তোমার বুকে আমি একটু আমার মুখটা রাখতে চাই।

—এই, এসব কি!

—একবার যদি চুমু খেতে দাও, আমি অমর হয়ে যাবো। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে, তোমাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে আমার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিই।

মনীষা একটু শব্দ করে হাসলো। যেন কোনো একটা শিশুকে ভোলাচ্ছে, এই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, কেন এ রকম ইচ্ছে করে?

—কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি! পৃথিবীর এক কোটি ছেলে এক কোটি মেয়েকে যতখানি ভালোবাসে, আমার ভালোবাসা তার চেয়েও বেশি!

মনীষা আবার হাসলো। হাসতে হাসতে খুব সহজভাবে বললো, কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি না।

এ কথায় আকাশ ভেঙে পড়তে পারতো। পৃথিবীতে প্লাবন অগ্নিবৃষ্টি ভূমিকম্প শুরু হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আমি সেদিকে

মনোযোগ দিইনি। আমি অনুতপ্ত গলায় বললাম, জানি, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো! সেদিন বৌবাজারের মোড়ে তোমাকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কেন যে ও'রকম করেছিলাম, আমি নিজেই জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করো—

মনীষা আমার এসব কথা যেন শুনতেই পায়নি। আপন মনেই বললো, না ভুল বললাম। তোমাকে ভালোবাসি না, সে কথা ঠিক নয়। তোমাকে ভালোবাসি, আরও অনেককে ভালোবাসি। সবাইকেই আমি ভালোবাসি, আমার তো সেরকম খারাপ লাগে না কারুকেই!

হঠাৎ আমার রাগ হলো। আমি একটু জোরেই বলে উঠলাম ওসব সবাইকে ভালোবাসা-টাসা আমি গ্রাহ্য করি না! বোগাস! আমি শুধু জানি আমার কথা আর তোমার কথা।

—তুমি আমাকে সত্যিই এ'রকম ভালোবাস? কই, আমি তো বুঝতে পারি না।

—কখনো বুঝতে পারোনি?

—কি জানি!

—মনীষা, ইয়ার্কি করো না। এটা ইয়ার্কি'র সময় নয়।

—তাহলে ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। ভালোবাসা মানে কি? বিশেষ কোনো একজনকে বিয়ে করতে চাওয়া? যারা বিয়ে করেছে, তাদের তো দেখেছি, সব ব্যাপারেই কি রকম ঘরোয়া আর সাধারণ হয়ে যায়।

আমি চট করে কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। ব্যাপারটা যে এ রকমভাবেও বলা যায়, আগে খেয়াল করিনি। কারুকে ভালোবাসা মানে কি তাকে বিয়ে করতে চাওয়া? বিয়ে করার পরে কি?

মনে মনে দুর্বল হয়ে গেলেও হার মানা যায় না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, তুমি আমার ওপরে এখনো রেগে আছো, সেদিন বৌ-বাজারের মোড়ে—

এবার তুমিই জোরে কথা বলছো। দিদির কিন্তু খুব পাতলা ঘুম। দিদি যদি দেখে ঘরে আলো জ্বলছে—

—আলো নিবিয়ে দাও—

—তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে ?

—যদি দাঁড়িয়ে না থাকি, তোমার পাশে শুয়ে পড়ি ? শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবো !

—কি পাগলের মতন আবোল-তাবোল কথা বলছো তখন থেকে ?

—এটা কি পাগলের মতন কথা ? আমি যদি তোমার পাশে শুয়ে তোমাকে একটু আদর করি, সেটা কি খুব দোষের ব্যাপার ?

—দোষ-গুণ জানি না। এটা ঠিক নয়।

—মনীষা, তোমার সঙ্গে সত্যি আমার অনেক কথা আছে।

—যাঃ! এবার লক্ষ্মীটি চলে যাও। এত রাত্রে এসব ভালো দেখায় না! তুমি বুঝতে পারছো না। এসব তোমাকে মানায় না। তোমার একটা সম্মান আছে।

—ধুত্তোরি ছাই সম্মান! তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমার এমন কষ্ট হয়!

আমি নিভিয়ে দিলাম নিজেই আলো। বসে-থাকা মনীষাকে শুইয়ে দিয়ে ওর বুকে আমার কাতর মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, মধুবন, তোমাকে আমি চাই, সেদিন বৌবাজারে আমি অন্যায় করেছি, তোমাকে দেখেও···রাগ করো না প্লীজ··তুমি কেন বৌবাজারে দাঁড়িয়ে ছিলে একা এ সময়ে···আমি তোমার জন্য···আঃ কি সুন্দর গন্ধ তোমার শরীরে···

না, এই ঘটনার এক বর্ণও সত্যি নয়। সবই আমার মনে মনে দেখা স্বপ্ন। বুকে হাত দিয়ে বলুক তো, কোন যুবক এ রকম স্বপ্ন দেখে না ?

সেই গঙ্গার ধার, সুজয়া, অরুণ আর হেমন্তর পাশে আমি দাঁড়িয়ে। মনে মনে আমি চলে গিয়েছিলাম মনীষার কাছে। নিছক ছেলেমানুষী কল্পনা। ওরকমভাবে কোনদিনই আমি মধ্যরাত্রে মনীষার ঘরে ঢুকতে পারবো না। মনীষার সঙ্গে অতক্ষণ একা একা কথা বলার সুযোগও কি পাবো কখনও ?

হুইস্কির বোতলটি শেষ হয়ে গেছে। অরুণ সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গঙ্গার জলে। সুজয়া বললো, খুব হয়েছে, এবার বাড়ি চলো।

হেমন্ত বললো, কিরে সুনীল, তুই এত গুম মেরে রয়েছিস কেন? চল, অরুণ আর সুজয়াকে নামিয়ে দিই, আমরা অবিনাশকে খুঁজি। বেশি বাজেনি, নাইট ইজ ইয়াং—

স্বপ্ন নয়। এবার বাস্তবের কথা হোক। বাস্তব এইরকম।

বাস্তবে আমি একজন সাধারণ মানুষ, ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, কয়েকজন ভাই-বোনের দাদা, একটা সাধারণ চাকরি করি। লিখে-টিখে কিছু সুনাম ও দুর্নাম হয়েছে, মাঝে মাঝে কিছু টাকাও পাই। ছাত্র বয়সে আর সবার মতই কিছুদিন বামপন্থী রাজনীতিতে মেতে উঠে দলীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা দেখে এবং দুর্বল নেতাদের নেতৃত্ব মানতে না চেয়ে সরেও এসেছি। কবিতা লিখে পৃথিবীটি বদলে দেবার উদ্ভট কল্পনা মাঝে মাঝে মাথায় ভর করে—যদিও ভিড়ের মধ্যে অতি সামান্য হয়ে মিশে থাকি।

অফিসে একটা মস্ত বড় হলঘরে আমি বসি। তখন বসতাম, যখন আমি সরকারী চাকরী করতাম। যখন আমি মায়াপাশে বাঁধা ছিলাম মনীষার কাছে। হলঘরটার সামনে একটা অর্ধেক দরজা। তার ওপাশে মানুষের কোমর পর্যন্ত দেখা যায়। বার বার দরজার দিকে চোখ পড়ে, দরজার তলা দিয়ে দেখতে পাই ধুতি পরা, প্যান্ট পরা, শাড়ি পরা দুটি করে পা হেঁটে আসছে। তাদের মুখ দেখার জন্য কৌতূহল থাকে। মানুষের শরীরের আর যে অংশই দেখা যাক না কেন, মুখটা না দেখলে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। সব মুখ দেখতে পেতাম না, কারণ দরজার ওপাশে মুখোমুখি দুই অফিসারের ঘর। অনেক চলন্ত পা শেষ পর্যন্ত আমাদের হলঘরটায় না ঢুকে অফিসারদের ঘরে ঢুকে যায়। সুতরাং দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ঐ সব জোড়া পা দেখতুম। মানুষের পায়ের গড়ন ও হাঁটার ভঙ্গি সম্পর্কে আমি প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলাম।

সরকারী অফিসে বিশেষ কেউ কাজ করে না। যে-টুকু কাজ না করলে নয়—সেটুকু সারার পর বাকী সময়টা গল্প করে। আমি কাজও করি না, গল্পও করি না। নাম সই করার সময় কলমটা খুলি, তারপর সারাক্ষণ কলমটা ব্লটিং প্যাডের ওপর পড়ে থাকে। তার পাশে জমে একটার পর একটা ফাইল। আমি সে সব ফাইল ছুঁই না, কখনো কখনো কলম দিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁকিবুকি কাটি। প্রাগৈতিহাসিক আমলের কত জন্তুর রূপ ফুটে ওঠে কলমের রেখায়। কাজ করি না মানে কি, সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর জমে, ধুলো মাখা নোংরা ফাইল, অস্পৃশ্যের মতন সেগুলো আমি দূরে সরিয়ে রাখি। সপ্তাহে তিন দিন টিফিনে যাবার আগে ফাইলগুলোর ফিতে খুলে মনোযোগ দিই ঘণ্টা দেড়েক। তাতেই সব ফাইল আবার চলে যায় অন্য টেবিলে। এর বেশি আর কাজ নেই। তারপর হাত ধুয়ে ফেলি।

প্রথম প্রথম আমি প্রত্যেকদিনই মিনিট চল্লিশেক ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করতাম। তখন সবাই আমাকে ঠাট্টা করে ভালো ছেলে বলতো। অফিসে আসার পরই সারাক্ষণ মুখ বুজে কাজ করা সত্যিই যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। তাহলে আন্দোলন ইত্যাদি করার সময় পাওয়া যাবে কখন? এই সব অফিসে কাজ হয় না বলে বাইরের একদল লোক আবার আন্দোলন করে। তাদের জন্য আবার আর একদল! যেমন, এ জি অফিস থেকে ঠিক সময় টাকা পাওয়া যায় না বলে শিক্ষকরা আন্দোলন করেন—আবার পড়াশুনো না-হওয়ার জন্য ছাত্ররা। ইত্যাদি। সে কথা যাক। আমি ভালো ছেলে হওয়ার অপবাদ নিতে চাইনি। তাছাড়া, পরে ভেবে দেখলাম, ঐ সামান্য কাজের জন্য প্রত্যেকদিন ওগুলো ছোঁয়ার কোন মানেও হয় না। অধিকাংশ ফাইলই অন্যায়ে ভরা।

লেখা-টেখার বিপদ এই যে, তাতে নানারকম খুঁত বেরিয়ে পড়ে। আমি যদি একজন শিক্ষককে দুশ্চরিত্র বলি, তাহলেই হয়তো কেউ বলবেন, সমস্ত শিক্ষক সমাজকে হেয় করা হয়েছে। যেমন, এখানে কেউ বলতে পারেন, আমরা সরকারী কর্মচারী এবং সারাদিন পরিশ্রম

করছি—আর উনি লিখলেন সরকারী অফিসে কোনো কাজ হয় না? তাহলে ব্যাপারটা এই রকম ভাবে বলা যায়। এমন অফিস আছে নিশ্চয়ই, যেখানে কর্মচারীরা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। সেরকম অফিস আমি চোখে দেখিনি। আমি সপ্তাহে তিনদিন ঘণ্টা দেড়েক কাজ করতাম। আমার নামে কখনো ফাঁকি দেবার অভিযোগ আসেনি।

মাঝে মাঝে দরজার ওপাশে টং টং করে বেল বাজানোর শব্দ হয়। তখন দরজা ঠেলে আমাদের বুড়ো আর্দালি রাজমোহন মুখ বাড়ায়। অর্থাৎ অফিসাররা কারুকে ডাকছেন। অফিসারের ঘরে ডাক পড়লে কেউ কেউ বিরক্ত হয়, কেউ কেউ খুশি হয়। রাজমোহন মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করে না, কারুর চোখে চোখ ফেলে ভুরুর ইসারায় জানিয়ে দেয় যে কোন অফিসার ডাকছেন।

রাজমোহন ব্রিটিশ আমল থেকে আর্দালির কাজ করছে। তার কাছে কর্মচারী মাত্রই হচ্ছে বাবু, আর অফিসার সাহেব। যেমন রাজেনবাবু, সুরেনবাবু কিংবা বরদাবাবু! আর ওপাশে দাস সাহেব, সেন সাহেব। আমাদের অফিসে তিনটে বাথরুম। একটাতে লেখা মেল, একটাতে ফিমেল, আর একটাতে গেজেটেড অফিসার।

রাজমোহন জানালো, আমাকে সেন সাহেব ডাকছেন। অফিসার ডাকলে তক্ষুনি যেতে নেই। অফিসার ডাকা মাত্রই যারা জ্বলন্ত সিগারেট নিভিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায়, তারা সাধারণত ঘুষখোর হিসেবে চিহ্নিত। যারা সৎ কর্মী তারা গায়ের আড়ামোড়া ভাঙে, টেবিলের গেলাস থেকে জল খায়, টেবিলের কাগজপত্রে পেপার-ওয়েট চাপা দেয়, তারপর আস্তে আস্তে গেলেই হলো। কিংবা তারা বেয়ারার সামনে মুখ-ঝামটা দিয়ে বলে, যাচ্ছি, যাচ্ছি! যাও না তুমি! কাজ ফেলে যেতে হবে নাকি? ভারি আমার ইয়ে এসেছেন! এই বলে তারা পেচ্ছাপ করার নাম করে বেরিয়ে গিয়ে দ্রুত অফিসারের ঘরে চলে যায়।

আমি ঘরে ঢোকার পর কিছুক্ষণ সেন সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন না। মনোযোগ দিয়ে একটা কাগজ পড়ছেন। এইটাই নিয়ম। এবং আমি দাঁড়িয়েই থাকবো, উনি বসতে বলবেন

না। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতন অফিসার যে নেই তা নয়। অনেক আছে—যাঁরা অধস্তন কর্মচারী ঘরে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকান, বসতে বলেন এবং স্বাভাবিক মানুষের মতন কথা বলেন। কিন্তু আমাদের সেন সাহেব একজন টিপিক্যাল গভর্নমেন্ট অফিসার।

অফিসের জীবনটা আমার কাছে কিছুদিন ধরে একঘেয়ে লাগছিল। সেন সাহেবের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হলো, একটু বৈচিত্র্য আনলে মন্দ হয় না।

আমাদের সেন সাহেবের পুরো নাম উপেন্দ্রনাথ সেন। বছর বাহান্ন বয়েস, পাঁচটি ছেলেমেয়ে—মাইনে খুব বেশি পান না, অফিসারের ঠাট বজায় রাখতে বেশ অসুবিধে হয়। কিছু উপরি রোজগার আছে। আমি যদি এই অফিসে কাজ না করতাম, যদি ট্রেনের কামরায় কিংবা ট্রামে-বাসে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো—আমি কি ওঁকে খুব বেশি গ্রাহ্য করতাম!

আমি বললাম, উপেনবাবু, আপনি ডেকেছিলেন আমায়—

সেন সাহেব রীতিমতন অবাক হয়ে তাকালেন। এখনও স্যার, বলে ডাকাই রেওয়াজ। সাহেবী আমল থেকে এটাই চলে আসছে। সেন সাহেব শুধু অবাক হলেন, আর কিছু না। আজকাল বড্ড ইউনিয়নের উপদ্রব। রাগ-টাগ দেখালে পরে পস্তাতে হয়। ইনসাবর্ডিনেশন, ইনডিসিপ্লিন—এসব কথা কেউ গ্রাহ্য করে না!

সেন সাহেব বললেন, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের কেসটা তো আপনিই করছেন। একবার ওদের অফিসে যেতে হবে। আজ বা কাল গেলেও হয়।

—কেন বলুন তো?

—কয়েকটা ওষুধের ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যাপারে—একটু পার্সোনালি না গেলে, বসুন না ঐ চেয়ারটায়।

আমি চেয়ারে না বসে ম্লান গলায় বললাম, আমার না গেলে হয় না?

—কেন, আপনার কোনো অসুবিধে আছে?

—হ্যাঁ অসুবিধে আছে। ওখানকার ম্যাড্রাসী অফিসারের সঙ্গে

ইংরিজিতে কথা বলতে হয়—

সেন সাহেব হেসে ফেললেন। আগেকার দিন হলে রাগ করতেন। অফিসে ডিসিপ্লিন রাখতে গেলে সব সময় রেগে থাকতে হয়। আজকাল ডিসিপ্লিনও নেই, সাহেবদের সেই মেজাজও নেই। এমন কি কাঁচা লংকাতেও আজকাল ঝাল কম।

সেন সাহেব হেসে বললেন, এটা আপনি কি বলছেন! আপনার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে, তাহলে অবশ্য –

—বনমালীবাবুকে পাঠান না। উনি খুব ভালো ইংরিজি বলতে পারেন। তাছাড়া, ম্যাড্রাসী অফিসারটির সঙ্গে ওঁর বেশ ভাব আছে—

—বনমালীবাবু আপনার চেয়ে ভালো ইংরিজি বলতে পারেন, এটা কি একটা কথা হলো? উনি তো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট!

—আগেকার দিনে ভালো ইংরিজি শেখানো হতো।

—তা অবশ্য ঠিক। আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা তো স্কুলে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফিও ইংরিজিতে পড়েছি। এখনকার বি-এ, এম-এ পাশ ছেলেদেরও দেখছি টেন্স জ্ঞান নেই। আমাদের সময় গ্রামার না শিখলে…

অফিসার কর্মচারী ইংরিজি ভাষা বিষয়ে আলোচনা করছে। আগেকার দিন ও এখনকার দিন। মিশনারী স্কুলে শিক্ষার মান ও অন্য স্কুলের অব্যবস্থা!

—তাহলে বনমালীবাবুকেই পাঠাবো?

—হ্যাঁ, উনিই ইংরিজিতে সব ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। ফাইলটাও ওঁর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ কেসটা আমি আর করবো না।

—ঠিক আছে। কিন্তু আপনি ইংরিজি বলতে পারবেন না বলে যাচ্ছেন না, এটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

তখন আমার বলতে ইচ্ছে করলো, তুমি কি একটা ন্যাকা? না কাঁঠালের আমসত্ত্ব?

রেগে না গিয়ে আমিও হাসলাম। বললাম, উপেনবাবু, আপনি "ইংরিজি" কথাটার মানে জানেন না? এটা তো একটা কোড।

সেন সাহেব বেশ ঘাবড়ে গেলেন। বিষয়টা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বললেন, ওঃ, তাই বলুন। আপনি তো শুনেছি কবিতা-টবিতা লেখেন। আপনারা ভাবুক লোক, আপনাদের কথা কি সবাই বুঝতে পারে। অফিসে এইসব নীরস কাজ করতে করতে আপনাদের কবিতা শুকিয়ে যায় না?

—এটা কবিতার ব্যাপার নয়, কিংবা ভাবের কথা নয়। "ইংরিজিতে" বলা মানে ঘুষের কথা বলা। এন্ টি সি'র কেসটাতে ঘুষের ব্যাপার আছে শুনেছি। সেটা কি আমাকে দিয়ে সুবিধে হবে?

সেন সাহেবের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। কি বলবেন, কথা খুঁজে পেলেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনি ভুল শুনেছেন।

আমিও খুব আস্তে আস্তে বললাম, আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি বলুন, কথাটা ভুল। তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। এটাও কি ভুল—পাবলিক সারভিস কমিশন থেকে তিনজন ক্যান্ডিডেট এসে রোজ ঘুরে যাচ্ছে, জয়েন করতে পারছে না—তার কারণ টেমপরারি বেসিসে যে তিনজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল—তারা দু'শো টাকা করে ঘুষ দিয়েছে। একটা টেন্ডারের ব্যাপারে গত সপ্তাহে একটা ওষুধ কম্পানি দু' হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। বলুন এগুলো মিথ্যে? তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। মানুষকে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করে আমার—

—সুনীলবাবু, আপনি একটু বসুন আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা থাকতে পারে না!

—আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন না!

—না, আমি বসবো না। আমাকে এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করবেন না দয়া করে। আমার ভীষণ ভয় করে। আমার চোখের সামনে যদি কেউ এক হাজার টাকার নোট এগিয়ে দেয়, তাহলে আমি হয়তো নিয়েও নিতে পারি! আমাকে পারচেজ সেকশন থেকে

সরিয়ে দিন। কোনো নিরিবিলি সেকশনে দিন। নইলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে!

সব কেরানিই সাধারণত অফিসারদের হিংসে করে। এটা এক ধরনের ঈর্ষা। অফিসারের আলাদা ঘর, গদিমোড়া চেয়ার ও বেশি মাইনে ও ক্ষমতার জন্য ঈর্ষা। সেই জন্য অফিসারের মুখের ওপর কেউ কড়া কথা বললে কেরানিরা খুশি হয়। এবং যত গোপন ঘরেই এই ঘটনা ঘটুক কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই জেনে যাবেই। ইউনিয়ানের পাণ্ডা ও নতুন ছেলে-ছোকরারা এই ব্যাপারের পর আমার সঙ্গে খুব মাখামাখি করতে লাগলো। তার এক মাস বাদে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।

এর কিছুদিন পর একটা আধাসরকারী সংস্থায় আমি নিজেই অফিসারের চাকরি পেয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, চেনাশুনোর জোরে। সেখানে আমারও আলাদা ঘর, জানালায় খসখসের পর্দা, মস্ত বড় টেবিল, চকচকে পেতলের বেল। প্রথম প্রথম আমি আস্ত গাড়লের মতন সুট-টাই পরে অফিসে যেতাম।

কিছুদিন আগেই আমি নিজে কেরানি ছিলাম বলে স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, পাশের ঘরের কেরানিরা আমাকে কী রকম ঈর্ষা করে। নিজেকে আমার মনে হতে লাগলো ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতন। আমার মাইনে যে-কোনো কেরানির ডবলের বেশি, এবং আর কতকগুলো সুযোগ সুবিধা পাই, কিন্তু কোন যোগ্যতায় আমি অফিসার হয়েছি? যে দেশে চল্লিশটি চাকরির পদের জন্য এক লক্ষ লোক দরখাস্ত পাঠায় সেখানে যোগ্যতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার অধীনে যে পঁয়ত্রিশ জন কর্মচারী আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন এম এ পাশ, একজন আবার দু' সাবজেক্টে। ছ'জন বি. এস-সি ও একজন এল সি ই—যাঁদের কেরানির কাজ করার কথাই নয়। ডবল এম এ পাশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কিছুতেই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। সবসময় মনে হয়, আমি অপরাধী।

অন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করছে, এটা জানলে এক ধরনের অহংকার জাগে। মনে হয়, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ব্যতিক্রম। আবার ভেতরে ভেতরে খানিকটা ভয়ও জন্মায়। এই অহংকার ও ভয়

মিশিয়ে তৈরি হয় ক্ষয় রোগ। ক্ষয়ে যায় মনুষ্যত্ব।

একলা বড় ঘরে সুট-টাই পরে অফিসার সেজে বসে থাকতে থাকতে প্রায়ই নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। মনে হতো, আমি ছদ্মবেশ ধরে আছি।

আমি যোগ্য নই। একজন বিধবা রমণী আমাদের দপ্তর থেকে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন, আমাকে বলতে হলো, কি করবো বলুন, সরকারের গ্রান্ট নেই! রমণীটি কেঁদে ফেললেন। আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। অফিসের মধ্যে কান্নাকাটি—একটা নুইসেন্স। কিন্তু এই অবস্থায় কি করা যায়! আমি বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললাম, রতনবাবুকে আসতে বলো। আমার অধস্তন কর্মচারী রতনবাবু এলে আমি বললাম, দেখুন তো, এই ভদ্রমহিলাকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা। ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনি যান, এর সঙ্গে কথা বলুন। যদি কিছু করা সম্ভব হয়, ইনি নিশ্চয়ই করবেন।

একটা চমৎকার জোচ্চুরির ব্যাপার ঘটে গেল। আমি খুব ভালোভাবেই জানি ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করার কোনো উপায়ই আমাদের অফিসের নেই। কিন্তু আমার ঘর থেকে কান্নাকাটির বিশ্রী দৃশ্য সরাবার জন্য আমি রতনবাবুর কাছে পাচার করে দিলাম। রতনবাবুও বুঝলেন ব্যাপারটা। কিন্তু উনিও অফিসে অধিকাংশ সময় কাজ করেন না, সুতরাং মাঝে মাঝে অফিসারকে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁকে তো নিতে হবেই।

আমার দু'জন সিনিয়র অফিসার সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। অফিসারদের শুধু সই মারতে হয়—একথা ঠিক নয়, অনেক দায়িত্বও নিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ওঁদের ঘরে কাজের পদ্ধতি দেখতে যেতাম। দু'জনেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ভালো মানুষ। খানিকটা কথাবার্তা বললেই বোঝা যায়, ব্রেন ওয়াশিং ব্যাপারটা শুধু দু'একটা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। এঁদের ব্রেন ওয়াশিং সমাপ্ত হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ চাকরি-সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া এঁদের আর কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা লুপ্ত বলা যায়। পে-স্কেল, অ্যালাওয়েন্স,

অন্যান্য অফিসারদের পদোন্নতি, ট্রান্সফার—এই নিয়ে একটা গণ্ডি। এইসব অফিসাররাই বি. এ পরীক্ষার সময় শেক্সপীয়ারের নাটক মুখস্থ করেছিলেন, ডব্লু. বি. সি. এস পরীক্ষায় লিখতে হয়েছে রক্তকরবীর সমালোচনা। আমি আমার ভবিষ্যতের চেহারাটা দেখে শিউরে উঠি।

পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন আমি আমার বেয়ারা রামপূজন সিংকে আপনি বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। এটা আমার হঠাৎ খেয়াল। বিহারের ছাপরা জেলার এক গ্রাম থেকে এসেছে রামপূজন, তার বয়েস সত্তরের কম নয়, লোককে বলে বাহান্ন। বহুকাল থেকে সে বেয়ারার পদে চাকরি করছে। দেশে তার জমি-জমা আছে, ছেলেপুলে নাতি-নাতনী, বছরে একবার দেশে যায়, ফেরার সময় প্রত্যেকবারই মাথা ন্যাড়া করে আসে। মাথা ন্যাড়া করাটা ওর শখ। চাকরি না করলেও তার চলে, কিন্তু চাকরিটা নেশার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। বস্তুত, রামপূজন বিহারের একজন মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ এবং বয়স্ক ব্যক্তি, আমার অধীনে সে বেয়ারার চাকরি করে বলেই তাকে তুমি বলে ডাকার অধিকার কি আমার আছে? বিহারের ছাপরা জেলায় যদি কখনো বেড়াতে যাই, সেখানে রামপূজনের মতন লোকের সঙ্গে দেখা হলে, এমন কি রামপূজনের বড় ছেলের সঙ্গে দেখা হলেও আপনি বলেই সম্বোধন করবো। তাহলে?

—রামপূজনজী, এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন তো?

—সাব?

—এক গেলাস জল নিয়ে আসুন। আর একটা কথা শুনুন, আমাকে শুধু সুনীলবাবু বলবেন। এখন থেকে আমাকে সাহেব বলে ডাকার দরকার নেই।

প্রত্যেক অফিসেই দু' একজন মাথা-পাগলা লোক থাকে। আমাকে সবাই সেই রকম মাথা-পাগলা লোক হিসেবে ধরে নিল। আগে যারা আমাকে ঈর্ষা করতো, এখন তারা আড়ালে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার সিনিয়ার অফিসার রায়চৌধুরী আমাকে ডেকে একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নাকি বেয়ারা-

দারোয়ানদের আপনি বলে কথা বলতে শুরু করেছেন। রোজ ওদের পায়ের ধুলোও নেন নাকি?

আমি চুপ করে রইলাম। রায়চৌধুরী তৃপ্তভাবে বললেন, ভালো, ব্যাপারটা ভালো। সারা দেশেই এইরকম নিয়ম চালু হওয়া উচিত। আমাদের বাড়িতে একজন বুড়ো চাকর ছিল, তাঁকে রাখুদা বলে ডাকতুম। কেউ তাকে শুধু রাখু বললে আমার বাবা খুব রাগ করতেন। আমার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তো—সেকালে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরই যা প্রতাপ ছিল—এখনকার মতন তো আর চুনোপুটিও ডেপুটি হতো না, আমার বাবা যেবার রায়গঞ্জে পোস্টেড, এক সাহেব···

চুপ করে শুনে গেলাম। বাবার গল্প থামিয়ে রায়চৌধুরী বললেন, কিন্তু রামপূজনকে যদি আপনি বলে ডাকা শুরু করেন— তাহলে ওকে দিয়ে কি আর জল টল আনানো উচিত? গুরুজনদের কি কেউ হুকুম করে?

রায়চৌধুরী দুষ্টুমীর চোখে তাকালেন আমার দিকে। কি রকম ঘায়েল করেছি—এইরকম একটা ভাব। সত্যি, আমার তুলনায় আর সবাই ভালো ভালো যুক্তি জানে। আমি এসব যুক্তির কোনো উত্তর দিতে পারি না।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ওর চাকরির মধ্যে যে-টুকু ডিউটি সেটা করায় কোনো অপমান নেই!

এসব করে কি হবে? আপনি একলা একলা কিছু করতে পারবেন? আপনি সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাতে পারবেন? আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নেতাদেরও তো বাড়িতে ঝি-চাকর থাকে। তারা কি ঝি-চাকরদের আপনি বলে?

—না, না, আমি সেসব কিছু ভাবি না—এটা আমার একটা খেয়াল।

—খেয়াল? এখনো বড্ড ছেলেমানুষ আছেন। থাকুন আর কিছুদিন, সরকারী চাকরির জাঁতায় কিছুদিন ঘুরলে সব খেয়াল-টেয়াল উবে যাবে।

রামপূজন নিজেই দুদিন বাদে এসে আমার কাছে ঘোরতর

আপত্তি জানালেন। হাত জোড় করে বললেন, সাব, আমার নোকরিটা ছাড়াবেন না। মেহেরবাণী করুন, আমি গরীব—

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, আপনার নোকরি ছাড়াবো কেন?

রামপুজন একটা মোক্ষম যুক্তি ছাড়লেন। তিনি বললেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হয়ে যদি তাঁকে আপনি-টাপনি বলি তাহলে নাকি তাঁর পাপ হবে। ব্রাহ্মণকেই সবাই সম্মান করে; ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য জাতের লোক কি সমান হতে পারে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রামপুজনজী, বাঙালী ব্রাহ্মণকেও কি কেউ সম্মান করে? তারা তো মাছ খায়!

রামপুজনের মতে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তখন বললাম, রামপুজনজী, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হলেও আমার জাত নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গোরুর মাংস খাই, শুয়োরের মাংস খাই—মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বারো জাতের ছোঁয়া খাই। আমি আপনার থেকেও নিচু জাত।

ন্যাড়া মাথা বৃদ্ধ রামপুজন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। হাত জোড় করলেন, চোখে জল এসে গেল, গাঢ় গলায় বললেন, হুজুর, আমার নোকরিটা খাবেন না। বুড়ো বয়েস ভুখা থাকবো—

কিছুতেই তাকে বোঝানো যায় না। চাকরি যাবার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু রামপুজনের যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ এলেন আমার পা জড়িয়ে ধরতে। হতাশা, বিরক্তি ও ক্লান্তিতে আমি মন মরা হয়ে রইলাম বেশ কিছুদিন।

আমাদের অফিসের অন্য একজন অফিসার, মিঃ করগুপ্ত একদিন আমাকে ডেকে বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি এত সিগারেট খান, আপনার লাইটার নেই?

—না।

—এতদিন বলেননি কেন?

আমার লাইটার নেই, এটা কি সকলকে ডেকে ডেকে বলার মতন ব্যাপার? আমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, সানগ্লাস নেই, সোয়েডের

জুতো নেই, চাবির রিং নেই, ছবির অ্যালবাম নেই একথা কি আমি লোকজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেড়াবো ? সুতরাং, 'আমাকে বলেননি কেন ?' এ প্রশ্নের উত্তরে আমাকে চুপ করে থাকতে হয়।

করগুপ্ত বললেন, স্মিথ কম্পানির ঐ যে লোকটা আসে চ্যাটার্জি, চেনেন তো, আমি ওকে বলে দেবো এখন! ও আমাকে একটা চমৎকার লাইটার দিয়েছে। আপনি বললেও হয়, কিন্তু আপনি লাজুক লোক—বলতে পারবেন না, আমিই বলে দেবো এখন।

—আমার লাইটার লাগে না। দেশলাইতেই চলে যায়।

—আরে মশাই, রনসন। ভালো জিনিস।

—চ্যাটার্জি কোথা থেকে দেবে ?

—ও কোথা থেকে পায় যেন। চৌধুরীকেও তো দিয়েছে।

রনসন কম্পানির লাইটার স্মিথ কম্পানির লোক কোথা থেকে আর পাবে—দোকান থেকে কিনবে—একথা শিশুও বোঝে। কিন্তু অফিসার হলে এসব বুঝতে নেই।

যদি আমার বন্ধু দীপক বা ভাস্করের পাল্লায় পড়তো, এক্ষুনি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু আমি মুখের ওপর লোককে অপমান করতে পারি না।

খানিকটা গোবেচারা-ভাব দেখিয়ে বললাম, আমি, জানেন, পকেটে কোনো ভারী জিনিস রাখতে ভালোবাসি না। আমার পকেটে নোট বুক থাকে না, এমন কি পার্স'ও না। লাইটারও ঐ জন্যই রাখি না—নইলে একটা কি আর কিনতে পারতাম না এতদিনে ?

মিঃ করগুপ্ত বিস্মিতভাবে বললেন, পকেটে পার্স'ও রাখেন না ? সব টাকা ব্যাঙ্কে ? খুব জমাচ্ছেন—বিয়েথা তো করেননি এখনো।

কী কথার কী উত্তর! পার্স ছাড়া শুধু পকেটে বুঝি টাকা পয়সা রাখা যায় না ?

আমি যে খুব একটা সাধুপুরুষ, আমি ঘুষ নিই না, পার্টির কাছ থেকে উপহার নিই না, বেয়ারাকে আপনি বলে ডেকে মহত্ত্ব দেখাই—এসব কিন্তু বোঝাতে চাইছি না। এতক্ষণ কি সেইরকম মনে হচ্ছিল ? আসলে অফিসের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য আমি নানারকম উপায় খুঁজতাম। এবং ঘুষ নেবার কোনো প্রলোভন

হলেই ভয় হতো আমার। নিজের ওপরেই আমার বিশ্বাস নেই। টাকা পয়সার লোভ সামলানো সহজ নয়। কিন্তু আমি জানতাম, একবার যদি আমি আমার এই হাত ঘুষ নিয়ে নোংরা করি, তাহলে সেই হাতে আর কোনোদিন আমি মনীষাকে ছুঁতে পারবো না। আমার এই ওষ্ঠ মনীষার নাম উচ্চারণ করে। এই ওষ্ঠে আর কোনোদিন মিথ্যে কথা বলা মানায় না। ভালোবাসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়! পট করে বললুম, আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। অমনি কি আমি তার ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি? পৃথিবীতে যারা যারা অন্যায় কাজ করে, তারা কেউ কখনো সত্যিকারের ভালোবাসেনি।

স্বপ্নের মধ্যে মনীষা আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, ভালোবাসা মানে কি? ভালোবাসা মানে কি কারুকে বিয়ে করার ইচ্ছে? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্নটা বড় গোলমেলে। আমি কলকাতা শহরে থাকি, মনীষার সঙ্গে চেনা, মনে হয় মনীষাকে না পেলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি জন্ম থেকেই দিল্লী কিংবা বেনারস কিংবা গৌহাটিতে থাকতাম, চিনতামই না মনীষাকে—সেখানকার কোনো মেয়ের জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। কিংবা সেখানে এমনভাবে মানুষ হতাম, যাতে বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করতাম যথা সময়ে; তার আগে বড় জোর দু' একটা মেয়ের সঙ্গে একটু বেড়াতে যাওয়া, আড়ালে হাসাহাসি বা ফষ্টিনষ্টি।

মনীষা আমার জীবনে বিশুদ্ধতা ও উচ্চাকাঙ্খা এনে দিয়েছে। মনীষার জন্য আমি ক্রমশ মানুষ হিসেবে ভালো হয়ে উঠতে চাই। মনীষার কথা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে একটু একটু কষ্ট হয়।

মনীষার কাছে আমি কি চাই? যখন দেখা হয় না,—তখন ওকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে। যখন দেখা হয়—তখন কিছুতেই কাছে পাই না। এই ধরা-না-ধরার খেলাই যেন আমার নিয়তি। অথচ আমি তো কতদিকে বেশ চটপটে, দরকার হলে লোককে ধমকাতে পারি, কাজ আদায় করতে পারি—এমনকি অন্য মেয়েদের

সঙ্গেও বেশ ইয়ার্কি' ফচকেমি করতে পারি। অথচ মনীষার কাছে কোনো চালাকিই চলে না।

সেবার কাকদ্বীপে পিকনিকে সুজয়া আমাকে বলেছিল, আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

ডাকবাংলোর ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম। ম্যাটমেটে জ্যোৎস্নায় পৃথিবীময় আবছায়া। দূরে গঙ্গা, জোনাকির মতন নৌকোর আলো। নীচে চাতালে হেমন্ত, সুবিমল, অরুণ, মনীষা আর কৃষ্ণা বসে গান গাইছে। সন্ধ্যেবেলা ডায়মন্ডহারবার থেকে এসে পৌঁছেছি এই বাংলোয়, কাল সারাদিন থাকবো। সুজয়া ছাদ দেখতে উঠেছিল আমার সঙ্গে। এখন নদী দেখছে।

—তোমার মতন এমন সুন্দরী মেয়ে আর কোথায় পাবো! অরুণ আগে বিয়ে করে ফেলেছে, তাই আমি আর বিয়ে করছি না।

—আহা-হা! আপনি সত্যি একটা বিয়ে করুন, আপনার বৌকে আমি সাজিয়ে দেবো।

—আমি রাজী।

—কি রাজী! সত্যি বিয়ে করছেন শিগগির?

—তা জানি না। যখন বিয়ে করবো, তখন আমার বৌকে তুমি সাজাবে। এতে রাজী।

—ঠিক করে বলুন না। আপনার কারুর সঙ্গে ঠিক-ঠাক আছে?

—কেউ আমাকে পাত্তাই দেয় না।

—কেন, সেই শিবানীর সঙ্গে কি হলো?

—ধ্যাৎ! আমি চিনিই না শিবানীকে।

—আমি তাহলে দেখবো আপনার জন্য?

—হ্যাঁ, দেখো না—

—সত্যি সত্যি বলছেন তো? এটা কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়।

—আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না।

করুন না বাবা, এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফেলুন। আমাদের দলে একজন বাড়বে।

—আমি কি বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি নাকি?

—মধুবনের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে—

এই প্রসঙ্গে মনীষার নাম করায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সুজয়া কি মনীষার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করতে চাইছে? মনীষার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করে বিয়ে হবে? ব্যাপারটা এতই অস্বস্তিকর আমার পক্ষে যে আমি তক্ষুনি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, চলো, নীচে যাই। অরুণ বোধহয় ভাবছে। আমি তার বউকে নিয়ে চুপি চুপি—

—কিছু ভাবছে না। শুনুন না—

—দেশলাই নেই। সিগারেট না খেতে পারলে প্রকৃতির দৃশ্য-ফিশ্য কিছুই আমার ভালো লাগে না।

—আপনি একদম সীরিয়াস নন্। একটা কথা বলবো—

—তুমি বিয়ের ঘটকালি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে নাকি? হেমন্ত, অবিনাশ, এদের জন্য সম্বন্ধ খোঁজো না। এরা আমার চেয়ে কত ভাল পাত্র—

আমি ছাদ থেকে চলে আসতে চাইছিলাম তক্ষুনি। কিন্তু সুজয়া আমার হাত চেপে ধরলো। বললো, এই আপনি পালাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান! আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

আমি মিটিমিটি হেসে চোখ পাকিয়ে বললাম, এই, ওরকমভাবে আমার হাত চেপে ধরলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে প্রেম করে ফেলবো বলে দিচ্ছি!

পরদিন সকালবেলা গেছি গঙ্গার ধারে। জলের কাছে যাবার উপায় নেই, এত কাদা। উঁচু পাড় থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত পঁচিশ তিরিশ গজ কাদায় থক-থক করছে। মনীষা তার মধ্য দিয়েই যাবে।

—গঙ্গার পারে এসে গঙ্গার জল ছোঁবে না? ধ্যাৎ, তার কোনো মানে হয় না।

এটা ঠিক ভক্তির কথা নয়। এক ধরনের কবিত্ব। যে বুঝতে পারবে, সে বুঝুক!

অরুণ বললো, এই মধুবন যাসনি। বিচ্ছিরি কাদা, পড়ে যাবি।

অরুণ ওর বোনকে ঠিক শাসন করতে কিংবা নিষেধ করতে পারে না। কেউই পারে না। অরুণ শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিল। যদিও জানতো, মনীষা যাবেই।

—তোমরা কেউ তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

হেমন্ত ডাক-বাংলোতে রয়ে গেছে। সকালে বেরোয়নি আমাদের সঙ্গে। হেমন্ত থাকলে তক্ষুনি রাজী হতো। হেমন্তর চরিত্রে প্রকৃত শিভালরি আছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শিভালরি দেখবার কথা নয়, মনীষা ঠিক আমাকেই না ডাকলে আমি তো যাবো না।

মনীষা ততক্ষণে কাদার মধ্যে নেমে পড়েছে। শাড়ীটা একটু উঁচু করেছিল, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতেই শাড়ী-টাড়ি কাদায় একেবারে মাখামাখি।

অরুণ বললো, এই মধুবন, কি হচ্ছে কি? তোর ঘেন্নাও করে না?

—পরে চান করে নেবো তো।

—পড়ে যাবি, তখন বুঝবি! পড়ে গেলে আর উঠতে পারবি না।

মনীষা পেছন ফিরে বললো, তোমরা একজন এসো না বাবা! আমার চোখে চোখ পড়লো। খানিকটা ধমকের সুরে বললো, দাঁড়িয়ে আছো কি? এসো!

জানতো, আমি ঠিক যাবো। তাই প্রথমেই বলেনি। চটি খুলে রেখে প্যান্ট পরা অবস্থাতেই নেমে গেলাম কাদার মধ্যে। অরুণ আর সুবিমল হাসতে লাগলো আমাকে দেখে। এক একটা পা কাদার মধ্যে এমন গেঁথে যাচ্ছে যে, টেনে তুলবার সময় ব্যালান্স থাকে না।

মনীষার কাছে গিয়ে ওর পিঠে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বললাম, ফেলে দিই!

মনীষা খপ করে আমার হাত চেপে ধরে বললো, এই, কি হচ্ছে কি? সত্যি পড়ে যাবো—

—তাই তো চাই! কাদায় একবার পড়লে চেহারাখানা যা

খুলবে না।

—তোমাকেও ফেলে দেবো—

মনীষাকে একটা ধাক্কা দিয়ে আমি ছপছপ করে দৌড়ে একটু দূরে সরে গেলাম। মনীষা পড়তে পড়তেও তাল সামলে নিল কোনক্রমে। তারপর তেড়ে এলো আমার দিকে।

ভাটার নদী। পাড়ের কাছে তাই বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এখন কাদা। দূরে বাঁধের ওপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আর নীচে এতখানি খোলা জায়গায় আমরা দু'জন কাদার মধ্যে ছপছপ করে দৌড়াদৌড়ি করছি।

দূরে দাঁড়িয়ে ওরা খেলা দেখছে, হাসছে। ততক্ষণে হেমন্ত এসে পেঁৗছে গেছে। হেমন্ত চেঁচিয়ে বললো, দাঁড়া, আমিও আসছি।

হেমন্ত এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে এক ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল কাদার মধ্যে। আমিও ওর পা ধরে দিলুম এক হ্যাঁচকা টান। তারপর দুজনেই কাদা-মাখা ভূত। মনীষার প্রায় কোমর পর্যন্ত কাদা পেঁৗছেছে, ওকেও ফেলে দেবার জন্য হেমন্ত আর আমি এগোলাম দুদিক থেকে। তার আগেই মনীষা পেঁৗছে গেল জলের কিনারায়। ঝাঁপিয়ে পড়লো, দু-দিক থেকে হেমন্ত আর আমিও।

অরুণ চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই, এখানকার জলে কুমীর আছে। তাছাড়া মাগুর মাছের মতন মস্ত বড় কাঁটাওয়ালা মাছ—

কে শোনে ও-সব কথা। জলে বেশ স্রোত, তাছাড়া আমাদের গায়ে পুরো জামা-প্যান্ট, সাঁতার কাটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু দারুণ আনন্দ পাচ্ছিলাম! আমরা তিনজনেই মোটামুটি ভালো সাঁতার জানি। যদিও গঙ্গা এখানে এত চওড়া, রীতিমত স্রোত—এমনিতে একা একা এখানে সাঁতার কাটতে সাহস পেতাম না। কিন্তু সেই সময় ভয়-ডরের কথা একবারও মনেই পড়েনি। মনীষা বললো, চলো, সাঁতরে ঐ দ্বীপটা পর্যন্ত যাবে? পারবে?

হেমন্ত বললো, তার চেয়ে ভাসতে ভাসতে বেশ সমুদ্রে চলে যাই—

আমি বললাম, সমুদ্র পেরিয়ে আন্দামানে···

না, আবার মনীষার কথা এসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতন সেইসব

দিন। আবার বাস্তবে ফিরে আসা যাক।

বাস্তব। আমার বাড়ি। একতলার ঘরে, সকাল সাড়ে দশটার সময়েও শুয়ে আছি।

মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, আজ অফিসে যাবি না ?

—না, আজ অফিস ছুটি।

—কালও তো যাসনি। কালকেও ছুটি ছিল ?

—হ্যাঁ, ছুটি মানে কি। আমাদের অফিস বিল্ডিং রং করা হচ্ছে, ফার্নিচার-টার্নিচার বদলানো হচ্ছে, তাই কাজ হচ্ছে না ক-দিন ধরে—

মায়েদের কাছে বাজে কথা বলে কিছুতেই পার পাওয়া যায় না। মা কাছে এগিয়ে এসে কপালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো ?

—না, না।

মা উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে, সত্যি করে বল তো ? অফিসে কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো ?

অফিসে আমার প্রায়ই গণ্ডগোল হয়। এ পর্যন্ত চারবার চাকরি ছেড়েছি। এই হাহাকারের দিনে চাকরি ছেড়ে আবার চাকরি পাওয়া সোজা কথা নয়। আমিও সহজে পাই না। এক একবার চাকরি ছেড়ে দু-এক বছর বেকার থাকি। আবার কোনো রকমে একটা জুটে যায়। প্রত্যেকবারই পাওয়াটা কঠিনতর হয়ে ওঠে। বাবা শিগগিরই রিটায়ার করবেন, দুটি ভাই-বোন এখনো স্কুলে পড়ে, প্রত্যেক মাসে ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া হয় না, মাসের শেষে মাছের টুকরো ছোটো হয়ে যায়, কোনো কোনোদিন অদৃশ্য।

চাকরি করতে অনেকেরই ভালো লাগে না, অফিসে মানিয়ে নিতে অনেকেরই অসুবিধে হয়। অনেক সময়ই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বিরোধ বাধে। কিন্তু তাহলেও ঝট্ করে চাকরি ছাড়া যায় না। মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচতে হয়, আস্তে আস্তে বয়েস বাড়লে বিবেকের সঙ্গে নানান কারচুপি করে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। কখনো খুব অসহ্য বোধ হলে ছুটি না নিয়ে অফিস কামাই করে

অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

—না, মা, কিছু হয়নি। অফিসে গণ্ডগোল হবে কেন?

—কারুর সঙ্গে রাগারাগি করেছিস নাকি?

—বলছি তো, সে-সব কিছু না!

বত্রিশ বছর বয়েসে মায়ের আদুরে ছেলে সাজতে মন্দ লাগে না। মা পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন, ছেলে সেটা উপভোগ করতে করতে অস্বীকার করছে। ছেলে বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললো, যাই একটু ঘুরে আসি একটা জায়গা থেকে।

মা বললেন, অফিসে যাবি না যখন, তখন আর এই রোদ্দুরের মধ্যে বেরুতে হবে না।

ছেলে একটু ভাবলো। তারপর বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, বেরুবো না। আর একবার চা হবে নাকি?

রাস্তায় বেরুলে শুধু যে রোদ তাই নয়। অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, হঠাৎ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সি আর· পি. লাঠি চালাতে পারে—অনেক রকম বাধা। যেখানে যাবার কথা, সেখানে অনেক সময়ই যাওয়া হয় না।

তার বদলে নিজের টেবিলে থুতনিতে হাত দিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে থাকলে অনেক কাজ হয়। মন মথুরায় চলে যায়। কিংবা মনীষার বাড়ির আশেপাশে। আজ স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। মনীষা আজ ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। এখন কি করছে?

ছাদের সেই ঘরে মনীষা এখন একা। মোটা মোটা বই থেকে নোট নিচ্ছে। আর এক মাস বাদে ওর ফাইনাল পরীক্ষা। ঈষৎ লালচে রঙের চুল ওর পিঠময় এলানো। দু-এক ফোঁটা ঘাম এসে জমেছে থুতনিতে।

—মনীষা, তোমাকে খুব ডিসটার্ব করতে ইচ্ছে করছে। পরীক্ষার আগে এত বেশি পড়াশুনা করা ভালো নয়। মাঝে মাঝে গল্পটল্প করে মাথা হালকা করে নিতে হয়।

—এই, যা, এখন নয়। অনেক পড়া বাকি। আমার যা ভয় করছে। কোর্সের অনেক কিছুই পড়ানো হয়নি ক্লাসে—

—এম-এ পরীক্ষার আগে কোনোদিনই কোর্স কমপ্লিট করা

হয় না। আমার পরীক্ষার আগে তুমি আমাকে ডিসটার্ব করেছিলে মনে নেই ?

—আমি ? বাঃ, আমি আবার কখন ডিসটার্ব করলাম ?

—নিশ্চয়ই ডিসটার্ব করেছো। এখন মনে পড়ছে না বুঝি ?

—কি মিথ্যুক তুমি ! আমি মোটেই তোমাকে···

—আমার পরীক্ষার ঠিক এগারো দিন আগে তোমরা কেন দীঘায় বেড়াতে গেলে ?

—তুমি তো যাওনি আমাদের সঙ্গে ?

—যাইনি বলেই তো বেশি ব্যাঘাত হয়েছে আমার পড়াশুনোর। তোমরা দীঘায় গিয়ে মজা করবে, আর আমি ঘরে বসে বসে মুখ বুঁজে পড়তে পারি ? বই খুললেই আমার চোখে ভেসে উঠতো, তোমরা দীঘার সমুদ্র পারে দৌড়োদৌড়ি করছো। হাওয়ায় তোমার শাড়ী উড়ছে, তুমি হাসতে হাসতে পা দিয়ে বালি ওড়াচ্ছো··· আমি এদিকে ঘরের মধ্যে একা। আমি রাত্তিরবেলা পড়তে বসলেই তুমি এসে আমার বইখাতা উল্টে দিতে। নইলে আমিও ছাত্র খুব খারাপ ছিলাম না, আমিও ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারতাম।

—আমি রাত্তিরবেলা তোমাদের বাড়িতে যেতাম ? অতদূরে ?

—আসতে না ? আমার চোখের দিকে তাকাও ? তাকিয়ে বলো তো !

—এই তো তাকিয়েছি চোখের দিকে। সত্যি যেতাম ? আমি তো জানি না—আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।

—মনীষা, তুমি এই যে হাঁটুতে থুতোনি ঠেকিয়ে বসে আছো, চুলগুলো উড়ছে, চোখে একটু অবাক-অবাক ভাব, পায়ের কাছে দেখা যাচ্ছে শায়ার লেস, আঙুলে কালির দাগ—এই দৃশ্যটা অমর হয়ে থাক। আমাদের বয়েস বাড়বে, বুড়ো হবো, একদিন মরবো—তুমি আমি কেউই আর এ পৃথিবীতে থাকবো না—নতুন মানুষ আসবে নতুন সমাজে—কিন্তু সেদিন তোমার এই বসে থাকার দৃশ্যটা পুরানো হবে না।

মনীষা মুখটা নিচু করলো। নিজের প্রশংসা ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। মুখময় অস্বস্তি ও লজ্জা। অবশ্য এটা ঠিক

প্রশংসা নয়, আমি তো ওকে সুন্দরী বলিনি, বলেছি শুধু বসে থাকার দৃশ্যটার কথা। আমার মতন পাষণ্ডেরও চিত্ত সমাহিত হয়। মনীষার কাছে এসে আমি তো দস্যু হয়ে উঠিনি, কোনো জালে ওকে জড়াবার চেষ্টা করিনি। মনীষার কাছে আমি কি চাই? কিছুই না।

মনীষা নরমভাবে অথচ অভিযোগের সুরে বললো, সুনীলদা, তুমি এসব কথা আমাকে কেন বলো, আমি বুঝতে পারি না। আমি একটা সামান্য মেয়ে—

—মোটেই সামান্য নয়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে কি বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন, ও জানে না ও কে। তোমার সম্পর্কে আমিও তাই বলতে চাই। তুমি জানো না, তুমি কে!

—ভ্যাট! শুধু ঐ সব বলে আমার পড়াশোনা নষ্ট করা হচ্ছে! আমি ফেল করলে কিন্তু সব দোষ তোমার!

—এম-এ পরীক্ষায় ফেল করতে হলে রীতিমতন প্রতিভা থাকা দরকার। আজকাল তো থার্ড ক্লাস নেই, সেকেন্ড ক্লাস ঠিক পেয়ে যাবে।

—কেন, আমি ফার্স্ট ক্লাস পেলে বুঝি তোমার খুব হিংসে হবে?

—ফার্স্ট ক্লাস পেলে তুমি তারপর কি করবে?

—রিসার্চ করবো।

—রিসার্চ করে ডক্টরেট পাবে। তারপর?

—বাবা রে বাবা! অতসব জানি না!

—ডক্টরেট হবার পর হয়তো বিলেত যাবে।

—না, আমি বিলেত যাবো না। আমার ভালো লাগে না—

—আচ্ছা, না হয় এখানেই কোনো কলেজে পড়াবে। কিংবা তোমার বিয়ে হবে, আস্তে আস্তে একটি দুটি সন্তান···

—এই, কি হচ্ছে কি?

—শোনো না। একটি দুটি সন্তান—খুব আইডিয়াল হয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সুখের সংসার—প্রথম প্রথম তোমার স্বামী তোমাকে অফিস থেকেও টেলিফোন করবে বার বার—কয়েক বছর পর সে একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে—অফিস থেকে বাড়ি

ফিরতে প্রায়ই দেরী হবে—তবু কিন্তু বিবাহ-বার্ষিকীতে ঠিক মনে করে দামী সেন্ট কিনে আনবে উপহার হিসেবে—মাঝে মাঝে ঝগড়া হবে—ভাবও হবে—ছেলেমেয়েরা যত বড় হবে—ততই তোমার আর তোমার স্বামীর দেখা দেবে অম্বলের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার বা ডায়াবিটিস হওয়াও অসম্ভব নয়—চুল পাকবে, চামড়া কুঁচকে আসবে তোমার—তারপর যদি সতী লক্ষ্মী হও—সিঁথির সিঁদুর নিয়ে স্বামীর আগেই তুমি যাবে—চিতার আগুনে জ্বলে যাবে তোমার ঐ নশ্বর দেহ—কিন্তু সেদিনও তোমার আজকের এই বসে থাকার ভঙ্গীটি, হাঁটুর ওপর থুতনি, অবাক-অবাক চোখে—এই দৃশ্যটি থেকে যাবে কোথাও না কোথাও।

—আমি বুড়ো হবো, মরবো। আর তুমি তখন কোথায় থাকবে?

—আমি হয়তো তার আগেই মরে যাবো। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ দীর্ঘায়ু নয়। বড় জোর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যদি বাঁচি, যথেষ্ট! শোনো একটা গল্প বলি। কোন্ একটা কবিতায় যেন পড়েছিলাম। এক বিরাট জমিদারের বাড়ির পাশে একটা কুঁড়ে ঘরে একজন গরীব লোক থাকতো। সে বলতো জমিদারবাবুর এই যে বিরাট সাত মহলা বাড়ি, এত বড় বাগান, ঘাট বাঁধানো কমল দিঘি, যার জল মানুষের চোখের মতন কালো, নহবৎখানা, সিংহের মূর্তি বসানো দরজা, আমিও এর মালিক। জমিদারবাবু কাগজপত্রে এসবের মালিক বটে, কিন্তু এই প্রাসাদ, বাগান, দিঘি, নহবৎখানা, সিংহদ্বার —এই সব কিছু মিলিয়ে যে দৃশ্যের শোভা, আমিও তার সমান অংশীদার। আমিও তা উপভোগ করি, আমার কাছ থেকে এই অধিকার কেউ কেড়ে-নিতে পারে না। বুঝলে মনীষা, আমি কুঁড়ে ঘরের গরীব লোকটার মতন।

মনীষা এই গল্পের মানে ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু মুখে তা স্বীকার করলো না। স্ফুরিত হাস্যে বললো, এটা গল্প না হেঁয়ালি? কিছুই মানে বুঝলাম না।

—বুঝলে না? মনীষা, আমি তোমাকে পেতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার।

মনীষা একটু কেঁপে উঠলো। পূর্ববৎ চোখ নীচু করে বললো,

সুনীলদা তুমি এসব কথা আমাকে বলো না। আমার ভয় করে। তোমার সঙ্গে কত লোকের চেনাশুনো, তুমি অনেক বড়—আমি একটা সামান্য মেয়ে—

—তুমি কে, তুমি তা জানো না।

বাইরে রাস্তায় পর পর দুটো বোমার আওয়াজ হলো। চমকে যেতেই হয়। আওয়াজের পর একাগ্রতা থাকে না। অত্যন্ত তন্ময় হয়ে মনীষার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ এই ব্যাঘাতে আমি প্রায় শারীরিক কষ্ট পেলাম বলা যায়। লেখা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম। কৌতূহল খোঁচা মারতে লাগলো ভেতরে, বেলা এখন সাড়ে এগারোটা—এই সময় বোমার আওয়াজ অন্যদিন শুনিনি। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

কিছু লোক দৌড়োদৌড়ি করছে। কিছু গাড়ি ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে দ্রুত। কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনো লোক আহত হয়নি, কেউ ধরা পড়েনি, বোমা দুটি ফাটার কোনো কারণই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ ধারে কাছে নেই, লুটতরাজের কোনো উদ্যোগও দেখা যায়নি। একটা অতি সাধারণ ঘটনা। কালকের কাগজে এর কোনো উল্লেখও থাকবে না। দুপুরে সাড়ে এগারোটায় বড় রাস্তায় শুধু দুটি বোমা ফেটেছে, এর আবার কোনো গুরুত্ব আছে নাকি?

পাশের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চিরঞ্জীব। প্রায় সময়ই ও ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, কি চিরঞ্জীব, কি ব্যাপার?

চিরঞ্জীব ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, কি জানি!

—কোথায় ফাটলো?

—ঐ মোড়ের মাথায়। মুদির দোকানটার সামনে—

—কারুর তো লাগে-টাগে নি মনে হচ্ছে।

—না লাগেনি।

এ সব নিছক কথার কথা। নেহাৎ চিরঞ্জীবের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, দু'একটা কথা তো বলতে হবেই। বোমার প্রসঙ্গ ত্যাগ করে

বললাম, তোমার খবর-টবর কি ?

—এই চলছে আর কি ! নতুন কিছু খবর নেই।

দরজা বন্ধ করে আমি ভেতরে ফিরে এলাম। কিন্তু এখন আর লেখায় মন বসানো সম্ভব নয়। বোমার প্রচণ্ড শব্দে আমি আবার বাস্তবে ফিরে এসেছি। 'বাস্তব' বলতে সাধারণত যা বোঝায়।

লেখার কাগজপত্র টেবিলে চাপা দিয়ে আমি খাটে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। হঠাৎ নিজের প্রতি আমার একটা ধিক্কার জন্মালো। কেন আমি মনীষার কথা লিখছি ? এ সব ধোঁয়াটে প্রেমের গপ্পো লেখার কোন মানে আছে আজকের দিনে ? কিংবা প্রেমও ঠিক নয়। জড়াজড়ি চুমু খাওয়ার কথা নেই, এক সঙ্গে বিছানায় শোওয়ার ভূমিকা নেই—হৃদয়বিদারক কোনো ঘটনাই নেই—এ আবার প্রেম নাকি ? তা ছাড়া এসব তো আমার নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার—এ নিয়ে অন্যের কি মাথাব্যথা আছে ! পৃথিবীতে এখন কত সমস্যা, কত প্রতিবাদ—লিখলে তাই নিয়েই লেখা উচিত।

চিরঞ্জীবের কথাই ধরা যাক। ছেলেবেলা থেকে দেখছি ওকে। আগে ছটফটে দুরন্ত ধরনের ছেলে ছিল। আজকাল বেশ গম্ভীর আর স্বল্পভাষী। প্রয়োজনের বেশি একটাও কথা বলে না। তিন বছর আগে বি-কম পাশ করে টানা বেকার বসে আছে! মাঝখানে তিনমাসের জন্য একটা ইস্কুলে লীভ ভ্যাকেন্সিতে মাস্টারি করেছিল —এ ছাড়া খাঁটি বেকার।

চিরঞ্জীব নিশ্চয়ই মনে মনে আমাকে হিংসে করে। আমি বেকার নই, আমি চাকরি করি। আমি মাঝে মাঝে অফিসে না গিয়ে খাটে শুয়ে বিলাসিতা করতে পারি! আর চিরঞ্জীবের দিনের পর দিন অসহ্য ছুটি। চিরঞ্জীব অবশ্য একটা কথা জানে না। আমি মনে মনে সব সময় চাকরি ছেড়ে দিতে চাই। 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি!' একটা কাজ করলে কি হয় ? যতদিন অন্য কোনো ব্যবস্থা না হয়, তার আগে—এখন যারা চাকরি করছে, তারা সবাই একযোগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কয়েক লক্ষ বেকারকে চাকরির সুযোগ দিলে কেমন হয় ? আমি রাজী। তাতে এখনকার চাকুরিজীবীরা অনুভব করতে পারবে দারিদ্র্যের কষ্ট! আর বেকার

বুঝতে পারবে চাকরির কষ্ট !

চিরঞ্জীব সম্পর্কে সবচেয়ে অসহ্য ব্যাপার হলো তার ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা। কখনো রাস্তার মোড়ে। সারা দিন-রাত তার কোনো কাজ নেই। একটা সুস্থ সবল যুবক। খেলার মাঠও নেই যে খেলাধুলো করবে। এমন একটা ক্লাবও নেই যে তাকে কোনো কিছুতে উৎসাহিত, ব্যস্ত রাখবে। মাঝে মাঝে পয়সা জোগাড় করে সিনেমা দেখা কিংবা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার একমাত্র কাজ। বই পড়া কিংবা গান-বাজনা থেকে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করার মতন মানসিক গঠন তার নয়। বেপরোয়াভাবে ঝুঁকি নিয়ে সে একলা দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেও পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মানিতে যখন হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক বেকার হয়ে পড়ে —তখন তারা রোজ সকালে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়ে চাষী মজুরদের কাছে যে কোনো রকম কাজের জন্য কাকুতি-মিনতি করতো —তার বদলে চাইতো একবেলার খাবার।

চিরঞ্জীবের সমস্যা নিয়ে কি আমার লেখা উচিত নয়? কিংবা চিরঞ্জীবের বন্ধু শিবু? শিবুকেও চিনি ছেলেবয়েস থেকে। এখন তাকে দেখতে পাই না। পুলিশ খুঁজছে তাকে—তার নামে সব সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ। অথচ শিবুকে আমি যা চিনি, সে কোনো অন্যায় করতে পারে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না। নতুন সমাজ গড়ার আগে সে এই সমাজটা ভেঙেচুরে দিতে চায়। আগে তার সঙ্গে যখন কথা বলেছি, তার যুক্তিগুলোর মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছে, তার কল্পনা-শক্তি একটু কমে গেছে। কিন্তু তার রাগ ও আক্রোশের কারণটা বুঝতে পারি। সেটা যথার্থ। রাগের সময় মানুষের যুক্তি প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভাঙার ইচ্ছে, ধ্বংসের ইচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে—নিজের জীবনে বঞ্চিত হলেই সেই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে।

চিরঞ্জীব কিংবা শিবুর জীবন ও সমস্যা নিয়েই বোধহয় আমার লেখা উচিত। প্যানপ্যানানি প্রেমের গল্প লেখার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে হয়, মনীষা সম্পর্কে লেখা এতগুলো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে দিই। গল্প-উপন্যাসে সমাজের মুক্তির পথ দেখানো উচিত নয়?

লেখকের উচিত নয়, মানুষের সামনে একটা আশার আলো তুলে ধরা? সবাই তো তাই বলে। শুধু আমিই বুঝতে পারি না কেন আমার কলম দিয়ে এইসব ব্যক্তিগত কথা বেরিয়ে আসে। কিন্তু ওদের কথা আমি কি করে লিখবো জানি না। আগে বার বার লিখতে গেছি, প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, সমস্যার ঠিক জায়গাটা আমি স্পর্শ করতে পারিনি। জীবনের হৃৎস্পন্দন শোনা যায় না। আমি ব্যর্থ। আমার ব্যর্থতার কথা আমি সমালোচকদের থেকেও ভালো জানি।

কি নিয়ে লিখতে হবে, তা লেখক জানে না। জানে সমালোচকরা। তারা বলে, ঐ লেখাটা প্রতিক্রিয়াশীল, অমুক লেখাটার পেছনে নিশ্চয়ই লেখকের কোনো কু-অভিসন্ধি আছে। যদি বলা যায়, 'বরং নিজেই তুমি লেখো না কেন একটি কবিতা!' হে সমালোচক, তুমি নিজেই লিখে দেখিয়ে দাও না, সত্যিকারের মহৎ আদর্শমূলক লেখা কী রকম হওয়া উচিত—তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কি নিয়ে লিখতে হবে, লেখক তা জানে না। সে শুধু জানে, লেখার কি দুঃখ। তা আর কেউ জানবে না। লেখকের জীবনীশক্তি তিল তিল করে ক্ষয়ে যায় লেখার মধ্যে। লিখতে লিখতে কোনো একটা সময় যখন পরবর্তী পরিচ্ছেদটার কথা আর মনে আসে না, একজন লেখকের জীবনে সেটা সবচেয়ে দুঃখের সময়। সে সময় সে খাবার খেয়ে কোনো স্বাদ পায় না, কারুর সঙ্গে কথা বলে কোনো আনন্দ পায় না, সমস্ত পৃথিবীকেই তার বিরুদ্ধবাদী মনে হয়।

'নার্স-নার্স', তোমার মুখখানা ঠিক আমার মায়ের মতন, কিন্তু তুমি আমার মায়ের মতন দুঃখী হয়ো না'—গত বছর এই লাইনটা লিখতে গিয়ে আমি কলম ফেলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম হঠাৎ। কেন কেঁদেছিলাম, আমি নিজেও তা জানি না। সেই সময় কেউ হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাকে দেখলে, নিশ্চয় পাগল ভাবতো। একজন সুস্থ সমর্থ লোক নিজের কল্পিত কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কাঁদছে—এর কোনো মানে হয়? পাগলামিই তো—সাহিত্য রচনা এক ধরনের পাগলামি ছাড়া আর কি? কী হয় এসব লিখে? এমন

কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উত্তর দিয়েছিলেন, কিছুই হয় না।

মনীষা এখন অনেক দূরে। সব ব্যাপারটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতন "মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধ্যেবেলা…" এই অনুচ্ছেদটা তো আমি নিজের ইচ্ছেতে লিখিনি। কলম নিয়ে বসবার পর আপনিই চলে এলো। মানুষের স্বপ্ন দেখা কেউ আটকাতে পারে? কখন কী রকম স্বপ্ন দেখা হবে, এ সম্পর্কে কোনো আইন করা যায়?

মনীষা, তোমার সম্পর্কেই আমার লিখতে ইচ্ছে করে। তোমার ঐ হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে বসে থাকা, অবাক-অবাক চোখ— পাতলা ঠোঁট দুটোতে সামান্য হাসির আভাস—বার বার মনে পড়ে এই দৃশ্যটা, এখনও চোখের সামনে জীবন্ত।

—সুনীলদা, আমি একটা সামান্য মেয়ে—

সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা।

এতখানি লেখার পর আমার মনে হচ্ছে, এবার কাহিনীর মধ্যে একজন ভিলেন আনা দরকার। সিনেমার সমালোচনায় যাদের বলে 'খলনায়ক'। একজন ভিলেন না থাকলে কাহিনী ঠিক জমে না। ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব, সাদা ও কালোর সীমারেখা—এইসব দেখতে আমরা অভ্যস্ত।

কিন্তু ভিলেন এখন কোথায় পাই? মনীষার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু সে সব একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন কি, দেবাশিস নামে একটি নামকরা সাঁতারু ছেলে একবার মনীষার প্রেমে পড়েছিল খুব, রোজ আসা যাওয়া শুরু করেছিল এবং স্বাভাবিক বাঙালী প্রথায় বাড়ির লোককে দিয়ে মনীষার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কি কারণে যেন সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। তবু ও যখন মনীষাকে বিয়ে করবার

জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল, তখনও আমি ওকে ঠিক ভিলেন হিসেবে ভাবতে পারিনি। দেবাশিসের ওপর আমার কক্ষনো রাগ হয়নি, বেশ সাধাসিধে ভালো মানুষ ধরনের ছেলে। হঠাৎ তার ভালো লেগেছিল মনীষাকে দেখে। হঠাৎ তার বিয়ে করার শখ হয়েছিল। এখনো তার সঙ্গে দেখা হয়, অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে, দুটি সন্তান, আমার কাছে মনীষার কথা জিজ্ঞেস করে। মনীষা সম্পর্কে এখনও ওর মনে একটু দুর্বলতা আছে! এ'রকম ভালো মানুষ ছেলেকে ভিলেন সাজালে আমার পাপ হবে।

বরুণদার এক বন্ধু মনীষার সঙ্গে দেখা হলেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতো। মুখে একটা ভগ্নী স্নেহের ভাব থাকলেও ওর হাতের গতিবিধি সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু ওঁকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না, কারণ মনীষা ওঁকে খুবই অপছন্দ করতো এবং পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতো। বরুণদার বন্ধু ওর ভেতরের গোপন লালসা মাঝে মাঝে বাইরে এনে ফেলত। কিন্তু ওসব কদর্যতা মনীষাকে স্পর্শ করে না।

মনীষার বাবা সম্পর্কে আমার ভেতরে একটু চাপা রাগ আছে বটে, কিন্তু উনি কোনোদিন আমার সঙ্গে ঠিক খারাপ ব্যবহার করেননি। ওঁর সামনে পড়লে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতাম, আর কিছু না।

তাছাড়া ভিলেন খুঁজতে হলে, নায়ক কে, তা আগে ঠিক করা দরকার। এ উপন্যাসে নায়িকা আছে, নায়ক নেই। আমি নিজের কথা একটু বেশি বলে ফেলেছি বটে, কিন্তু নায়কের সাজ আমাকে মানায় না। আমি পার্শ্বচরিত্র, কিংবা উপন্যাসের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা মানতে হলে আমাকেই ভিলেন বলা উচিত। একটু পরেই তা বোঝা যাবে।

হেমন্ত আমার অফিসে এসে বললো, চল, এক্ষুনি তোকে বেরুতে হবে।

হেমন্ত আমার অফিসে সাধারণত আসে না। ও কাজ করে কমার্শিয়াল ফার্মে, ওকে সত্যিই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বেরুবার সুযোগ পায় না অফিস থেকে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার ? এত হন্তদন্ত হয়ে এলি যে ? বোস বোস !

—না, বসবো না। চল, বেরুবো।

—এক্ষুনি বেরুবো কি করে ? কয়েকটা কাজ আছে।

হেমন্ত রেগে গিয়ে বললো, রাখ রাখ ! কাজ দেখাসনি বেশি। তোদের গভর্নমেন্ট অফিসে আবার কাজ ! ছ'মাস আটমাস ধরে বিল আটকে থাকে আমাদের—

—আমাদের ডিপার্টমেন্ট সে রকম নয়। এখানে সত্যিই কাজ হয়।

হেমন্ত হাতের ধাক্কায় টেবিল থেকে কিছু কাগজপত্র ফেলে দিয়ে বললো, চল, চল, ওঠ তো !

তাকিয়ে দেখলাম, কোনো কারণে হেমন্ত বেশ রেগে আছে। আর বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই ওকে। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসের বাইরে এসেও হেমন্ত গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবি ?

হেমন্ত বললো, কি কারণে যেন আজ বাস বন্ধ। ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হবে।

—কোথায় যাবি ট্যাক্সি নিয়ে ? অফিস যাসনি ?

—ধ্যাৎ, ভালো লাগছে না অফিস-টফিস করতে—

—কোথায় যাবি তাহলে ?

হেমন্ত আমার চোখের দিকে তাকালো। অন্যমনস্কভাবে বললো, কোথায় যাওয়া যায় বল তো ? এক কাজ করলে মন্দ হয় না, কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বসে যদি বীয়ার খাওয়া যায়—

—এখন তিনটে বাজে। এখন থেকেই যদি বীয়ার শুরু করিস।

—সন্ধ্যের পর মাতাল হয়ে যাবো ? ক্ষতি কি ?

—তার চেয়ে চল কোনো সিনেমায় ঢুকে পড়ি।

হেমন্ত রীতিমতন রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বললো, মেয়েছেলেদের মতন তোর অত সিনেমা দেখার ইচ্ছে কেন ?

—তাহলে কী করতে চাস বল না ?

—চল, অবিনাশকে ডেকে ওর মাথায় কাঁঠাল ভাঙি !

—অবিনাশকে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সুবিমলের কাছে যাই চল—

—সুবিমলের কাছে? ওর অফিস তো অনেক দূরে। আর বিচ্ছিরি অফিস।

—না, না অফিসে না। ও ছুটি নিয়েছে। সুবিমল একটা বাড়ি বানাচ্ছে—কলকাতা থেকে চার পাঁচটা স্টেশন দূরে। ও একলা একলা সেখানে মিস্তিরি খাটায়—আমাদের যেতে বলেছে—

—সেখানে গিয়ে কি করবো?

—ট্রেনে ঘুরে আসা হবে। দেখে আসি জায়গাটা কি রকম?

—তুই চিনতে পারবি—

—খুঁজে বার করা যাবে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে উঠবে—আয় ট্রাম ধরি—

হঠাৎ অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কি মানে হয়? সুবিমলের সঙ্গে তো আমাদের কোনো দরকারী কথা নেই! এভাবে কেউ যায় না। বেশির ভাগ মানুষই সুস্থভাবে অফিস করে, গরমের সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে গা ধোয়। আর আমরা বিনা কারণে সুবিমলের কাছে হুট করে চলে গেলাম, রাত্তিরে আর বাড়িতে ফেরাই হলো না।

অল্প দূরের জার্নি, তাই হেমন্ত ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছে। কলেজ-টলেজ ছুটি হয়নি, তাই ফার্স্ট ক্লাস এখন পুরো ফাঁকা। কয়েকটা ভিখিরির ছেলে ও ফেরিওয়ালা বসে জটলা করছে।

দু'জনে দুই জানালার ধারে মুখোমুখি বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে আমি হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার রে তোর! আজ এত ছটফট করছিস কেন?

—ছটফট করছি কোথায়?

—চালাকি করিস না। কী হয়েছে কি?

—হয়নি কিছুই। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আজ মনীষার বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—তোকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছেও কয়েকদিন আগে তোর খোঁজ করছিলেন। দেখা হলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করেন। কি

বললেন ?

—কিছু না। এমনিই অনেক গল্প-টল্প করলেন। শেষকালে হঠাৎ বললেন, হেমন্ত, তুমি আমার একটা উপকার করবে ? তুমি মধুবনের জন্য একটা পাত্র খুঁজে দাও না।

আমি অবাক হলাম না। মুচকি হেসে বললাম, তোকে বললেন এই কথা !

—হ্যাঁ, আমি কি মাইরি প্রজাপতি অফিস খুলেছি নাকি যে পাত্র ধরে দেবো ? হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এই কথা। উনি বললেন, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না—আর আমার ছেলে দুটোও কোনো কম্মের না—তোমরা যদি একটু সাহায্য না করো—

—অরুণ তখন বাড়িতে ছিল না ?

—না। মনীষার বাবা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে একলা ঘরের মধ্যে গম্ভীরভাবে এই কথা বলতে লাগলেন—আমি ব্যাপারটার মানেই বুঝতে পারলাম না।

—তুই কি বললি ?

আমি আর কি বলবো ? বললাম, আপনি মনীষার জন্য এখনই এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? ও তো এখনো পড়াশুনো করছে। উনি বললেন, ওর এম· এ· পরীক্ষা দু' চারদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর রিসার্চ যদি করতে চায়, বিয়ের পর করুক। আমার শরীরটা ভালো নয়, আমি ওর বিয়েটা দিয়ে যেতে চাই।

—কাকাবাবুর শরীর খারাপের কথা তো শুনিনি।

—বললেন তো, হার্টে কি সব হয়েছে।

—মনীষার সঙ্গে তোর দেখা হলো ?

—হ্যাঁ, একটুক্ষণের জন্য। পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত। তোর কথা জিজ্ঞেস করলো।

—আমার সঙ্গে দেখা হলেও তোর কথা জিজ্ঞেস করে। যাকগে, এই জন্য তুই এত ছটফট করছিস ?

—মোটেই ছটফট করছি না। কিন্তু মনীষার বিয়ের চেষ্টা চলছে —এ কথা শুনে তোর খারাপ লাগলো না ?

—না, কেন খারাপ লাগবে ? তোর লেগেছে বুঝি ?

—নিশ্চয়ই লেগেছে। আমি তোর মতন হিপক্রিট নই। কিন্তু আমি ভাবছি, মনীষার বাবার চারদিকে এত জানাশোনা—এত লোক থাকতে, উনি হঠাৎ আমাকে ডেকে মনীষার জন্য পাত্র খুঁজতে বললেন কেন? প্রকারান্তরে কি বুঝিয়ে দিলেন, আমরা যাতে মনীষার সঙ্গে আর না মিশি?

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, তুই একটা বুদ্ধু। বুঝতে পারলি না? উনি প্রকারান্তরে জানতে চাইছেন তুই মনীষাকে বিয়ে করতে রাজী আছিস কিনা। পাত্র হিসেবে তোকেই ও'র পছন্দ হয়েছে।

হেমন্ত কঠিনভাবে তাকাল আমার দিকে। গম্ভীরভাবে বললো, সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি'র কোনো মানে হয় না।

—এতে ঠাট্টা ইয়ার্কি'র কি আছে?

হেমন্ত ঝট্ করে আমার বুকের কাছে জামাটা চেপে ধরে বললো, যদি চুপ না করিস তো এক থাপ্পড় মারবো!

আমিও ঝুঁকে খপ্ করে হেমন্তর জামাটা ধরে এক টান মারলাম। হঠাৎ ছিঁড়ে গেল জামাটা! হেমন্ত সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, শালা, তোমার জামাও আমি আস্ত রাখবো না।

ও টানাটানি করতে লাগলো, আমি বসে রইলাম নিশ্চেষ্টভাবে। প্রথমে ছিঁড়লো দুটো বোতাম, তারপর অনেকখানি ফেসে গেল। তারপর দুজনেই হেসে সিগারেট ধরালাম। হেমন্ত এবার শান্ত হয়ে মিষ্টি হেসে বললো, তুই একটা কাওয়ার্ড! নিনকমপুফ! পুরুষ নামের অযোগ্য! তুই মনীষাকে ভালোবাসিস সে কথা সাহসের সঙ্গে ওর বাবার কাছে বলতে পারিস না? অন্তত অরুণকেও তো বলতে পারিস?

—হঠাৎ ওদের কাছে আমি ভালোবাসার কথা বলতে যাবো কেন? ওরা আমাকে পাগল ভাববে না?

—তাহলে মনীষাকে বল, ওদের বলতে।

—আমি তো মনীষাকেও কোনোদিন বলিনি, আমি ওকে ভালোবাসি।

—তা বলতে পারবে কেন ? শুধু ন্যাকামি করতে পারো। ঠিক আছে, আমি মনীষার বাবাকে কালকেই বলবো, আমি পাত্র পেয়ে গেছি।

—খবর্দার ও কাজ করতে যাসনি। ঘটক একটা সম্বন্ধ আনলো, তারপর যদি দেখা যায় পাত্রপক্ষ রাজী নয়—তাহলে সে ঘটকের খুব বদনাম হয়ে যায়।

—তুই রাজী না ? ফের চালাকি ?

হেমন্ত ঝট করে আমার চশমাটা খুলে নিয়ে জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে বললো, ফেলে দিই ?

আমিও হেমন্তর বুক পকেট থেকে মানি ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললাম, আমি ফেলে দিই এটা ?

—তাহলে আমি তোর প্যান্টুলুন খুলে নেবো।

—আমিও তোর আন্ডারওয়্যার না খুলে ছাড়বো না।

তিরিশ বছর পেরিয়ে যাওয়া দুজন পুরুষ মানুষ এই ধরনের ছেলেমানুষী করছিল। আমাদের বন্ধুত্ব এ রকম।

হেমন্ত বললো, তুই মনীষাকে চাস না ?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, না, আমি মনীষাকে চাই না।

—এর মানে কি ?

—এর মানে খুব সহজ। তুই মনীষাকে বিয়ে কর। মনীষার বাবা তাই চান। মনীষাও আপত্তি করবে না।

হেমন্তর সুন্দর সহাস্য মুখখানা বিমর্ষ হয়ে এলো। রিক্ত মানুষের মতন বললো, মনীষাকে আমি বিয়ে করবো ? এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি ওর যোগ্য নই।

—তুই ওর যোগ্য না ? মনীষা একটা সামান্য মেয়ে। এমন কি ব্যাপার আছে ওর ? তবে সব মিলিয়ে মেয়েটা বেশ ভালো। তোর সঙ্গে মানাবে।

হেমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, সুনীল তুই কোনোদিন যা করিস না আমার সঙ্গে আজ তাই করার চেষ্টা করছিস। তুই লুকোচুরি খেলছিস আমার সঙ্গে। তোর মুখখানা মিথ্যেবাদীর মতন দেখাচ্ছে।

—বিশ্বাস কর হেমন্ত, আমি তোকে একটুও মিথ্যে কথা বলছি না।

—প্লিজ, আমার সঙ্গে এ'রকম ব্যবহার করিস না। আমার আজ মন খারাপ।

—তোর সঙ্গে যখন মনীষার দেখা হলো, তুই ওকে বললি না যে ওর বাবা ওর জন্য পাত্র খ‍ুঁজছেন?

—যাঃ, তা কখনো বলা যায়?

—মনীষাকে সব বলা যায়।

—একটা কাজ করলে হতো, আজ আসবার সময় মনীষাকে নিয়ে এলে হতো। ও তো বেড়াতে ভালোবাসে—রাজী হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

—শ‍ুনলে নিশ্চয়ই রাজী হতো। কিন্তু তুই ওর দেখা পেতিস না এখন।

—কেন? কোথায় গেছে?

—তা আমি জানি না। তবে, যখন মনীষাকে খ‍ুব খোঁজা যায়, তখন ওকে কিছ‍ুতেই পাওয়া যায় না।

ট্রেন থেকে নামলাম, দ‍ু'জনেরই ছেঁড়া জামা। লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তবে, যে-সময়ের কথা বলছি, তখনও কোনো জায়গায় অচেনা লোককে দেখলেই লোকে সন্দেহ করে না। আমাদের দেখে মজা পাচ্ছে। কেউ কেউ ভাবতে পারে, আমরা দ‍ু'জনেই কোনো গ‍ুণ্ডা দলের পাল্লায় পড়েছিলাম।

স‍ুবিমলের বাড়ি কোথায় বানানো হচ্ছে জানি না। সাইকেল রিক্সায় চড়ে বসলাম। বললাম, ভাই কোথায় কোথায় নতুন বাড়ি বানানো হচ্ছে, চল‍ুন তো?

রিক্সাওয়ালা অবাক হতেই হেমন্ত বললো, আমরা ইন্সপেক্টার। কোথাও নতুন বাড়ি তৈরি হলেই আমরা দেখতে যাই।

ছোট্ট শহর। ঘিঞ্জি দোকানপাট। রাস্তায় কাদা। সে-সব একটু পেরিয়ে যেতেই বহ‍ুদ‍ূর ছড়ানো আকাশ, তেপান্তর শব্দটা মনে পড়বার মতন মাঠ। একটা খাল ভর্তি কচুরিপানা, তার ওপর কাঠের ব্রিজ, সেখান দিয়ে ভারী লরি চলাচল করা নিষেধ—এই কথাটা

লেখা আছে।

ছাতা মাথায় দিয়ে সুবিমল মিস্তিরিদের তদারক করছিল। আমাদের দেখে যত অবাক, তারচেয়ে বেশি খুশি। আমার ছেঁড়া জামার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পুরপুর করে আরও খানিকটা ছিঁড়ে দিয়ে বললো, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড! আমার জামাটাও ছিঁড়ে দে না!

—হ্যাৎ পাগলা?

সুবিমল সহাস্য মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে। তারপর বললো, মাইরি কি ভালো যে লাগছে না তোদের দেখে—কি বলবো! একা একা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আমার মনে হচ্ছিল, আমার কোনো বন্ধু নেই। আমার কথা আর কেউ ভাবে না।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, তুই আজকাল এখানেই থাকিস বুঝি? তাই তোর দেখা পাই না।

—হঠাৎ কি ভেবে আমার কাছে এসেছিস বল তো?

—এমনিই।

—চমৎকার! অবিকল সেই পুরানো দিনের মতন, তাই না? যখন আমরা বিনা কারণে কত কি করতাম!

—কতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

—আমাকে তোদের দলে নিবি? আমি আলাদা হয়ে গেছি, না রে? আমি বিয়ে করেছি, বাড়ি বানাচ্ছি—

—হ্যাঁ, তুই আলাদা!

—আগেকার মতন আবার একসঙ্গে হল্লা করা যায় না? আয়, আমরা তিনজনেই জামা খুলে ফেলে খালি গায়ে ঘুরি। জুতো খুলে ফ্যাল! তোরা কিন্তু আজ রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারবি না।

—বাড়ি ফিরবো না তো কি করবো?

—আমি এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। পেল্লায় পেল্লায় ঘর—ঢাউস বারান্দা। মাদুর পেতে দেবো, শুয়ে পড়বি!

—তুই এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেলেছিস পর্যন্ত?

—নিজে সব দেখাশুনো করতে হবে না? ১৭ই জুলাইয়ের মধ্যে কমপ্লিট করবো—সেদিন গৃহপ্রবেশ হবে, আসতে হবে কিন্তু

তোদের !

—১৭ই জুলাইতেই গৃহপ্রবেশ কেন ? খুব শুভদিন বুঝি ? এক গলা হেসে সুবিমল বললো নিশ্চয়ই। ঐটা আমার জন্ম তারিখ, আমার বিয়েরও তারিখ।

হেমন্ত বললো, তোর বাড়ি তো এখনও কিছুই হয়নি রে। শুধু খোঁড়াখুঁড়ি চলছে দেখছি।

—ভিত হচ্ছে। ভিত হয়ে গেলেই তো আদ্ধেক হয়ে গেল। তারপর ছাদ ঢালাইয়ের সময় যা একটু ঝামেলা। এই দ্যাখ না, ঐ খানটায় বসবার ঘর, সামনে বারান্দা—এই যে এদিকে—তিনটে বেডরুম, বাথরুম অ্যাটাচড্—

ফাঁকা মাঠের দিকে হাত উঁচু করে সুবিমল এই সব দেখাচ্ছিল। হেমন্ত বললো, তোর সত্যি কল্পনা-শক্তি আছে। তুই সব দেখতে পাচ্ছিস ?

—সব ! ছবির মতন চোখে ভাসছে। এই সুনীল, সরে আয়, ঐখানে একটা সাপের গর্ত আছে।

আমি চমকে একটা লাফ দিলাম। গর্ত একটা সেখানে আছে সত্যি।

—এটা সাপের গর্ত ?

—আজ সকালেও সাপটা বেরিয়েছিল। অ্যাত্ত বড়, খাঁটি গোখরো—আমার দিকে ফণা তুলে গম্ভীর চালে তাকালো।

—মারলি না ?

—মারবো কি ? পাগল ! বাস্তু সাপ কেউ মারে ? বাস্তু সাপ থাকলে লক্ষ্মী আসে ।

আমার গা শিরশির করছে। সাপের নাম শুনলেই অস্বস্তি লাগে। আড়চোখে তাকালাম গর্তটার দিকে। এমনও হতে পারে, সুবিমল বানিয়ে বলছে। সুবিমল অম্লানমুখে মিথ্যে গল্প বানায়। এই যে বাড়িটা বানাচ্ছে—হয়তো এটাও সত্যিকারের ওর বাড়ি নয়।

সুবিমল মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে বললো, এই যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছিস, এ জায়গাটা আগে কি ছিল বল্ তো ? নদী ছিল। হরেন মিস্তিরির বয়েস পঁচাশি, তার বাবা দেখেছে সেই নদী। তারও

আগে এখানে সমুদ্র ছিল নিশ্চয়—এখান থেকে সমুদ্র মাত্র তিরিশ-বত্রিশ মাইল দূরে। গোটা বাংলাদেশটাই তো সমুদ্রের চড়া। মাইরি, ভাবতে অদ্ভুত লাগে না—একদিন যেখানে নদী কিংবা সমুদ্র ছিল এখন আমি সেখানে বাড়ি বানাচ্ছি। সব ব্যাপারটাই যেন মনে হয় ম্যাজিক।

একটা ছোট পুকুরের মতন কাটানো হয়েছে। থরে থরে সাজানো ইঁট। টাল দিয়ে রাখা আছে সুরকি। সুরকির স্তূপে পা ডুবিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেবেলার মতন সুরকির মধ্যে হুটোপুটি করে খেলা করতে ইচ্ছে হয়।

মিস্তিরি খাটছে আট দশজন, ছাতা মাথায় দিয়ে সুবিমল তদারক করছে তাদের। যদিও রোদ পড়ে এসেছে। খালের ধারে দাঁড়িয়ে হেমন্ত দেখছে কচুরিপানার শলথ ভেসে যাওয়া।

একটু বাদে হেমন্ত ফিরে এসে বললো, হ্যাঁ রে, সুবিমল, এ সব কেমন লাগে রে?

—কি সব?

—এই বিয়ে করা, বাড়ি বানানো? আমাদের তো এ সবের অভিজ্ঞতা নেই। হঠাৎ একটা মেয়েকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা, তার প্রীতির জন্য বাড়ি বানাতে হয়। হঠাৎ একটা দুটো বাচ্চা জন্মে বিছানার ভাগ নিয়ে নেয়—এ সব কি রকম লাগে?

সুবিমল ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, আমার মতে, মেয়েদের বিয়ে করা উচিত, ছেলেদের বিয়ে করা উচিত না।

আমি বললাম, তাহলে মেয়েদের বিয়েটা কি মেয়েতে মেয়েতে হবে?

না। আনফরচুনেটলি, ছেলেরা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। কিংবা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিবশত বিয়ে করে ফেলে। তারপর বন্দীজীবন। ভারত স্বাধীন হয়েছে উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট, আর আমি পরাধীন হয়েছি উনিশ শো তেষট্টি সালের সেভেনটিনথ জুলাই।

কথা বলার সময় সুবিমলের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে থাকে সব

সময়। এরকম আনন্দময় মানুষ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ নেই।

হেমন্ত বললো, তোর মতন সুখী পরাধীন মানুষ আমি আগে দেখিনি।

—না রে। তোরাই সুখী। স্বাধীনতার মতন কি সুখ আছে? যে মেয়েকে কিছু দিতে হয় না, তাকে আদর করায় কত বেশি আরাম বল তো! আসলে দেখ না স্ত্রীর জন্য জমি কিনতে হয়—লাইফ ইনসিওরেন্স করতে হয়, দিনের অনেকগুলো ঘণ্টা উৎসর্গ করে দিতে হয়।

—তা সত্ত্বেও তোর বাড়ি বানানোর এত উৎসাহ? মেয়েকে লরেটোতে ঢোকাবার জন্য ঘোরাঘুরি করছিস!

সুবিমল নিঃশব্দে হেসে বললে, এ পথ ভালোই লাগেরে! আসলে কি জানিস, মানুষ স্বাধীন থাকতে চায় না। কিংবা যখন সে পরাধীন থাকে, তখন ছটফট করে—স্বাধীনতার জন্য। আবার স্বাধীন হলেই চায়, কোনো না কোনো আদর্শ অথবা কোনো না কোনো নেতার হাতে—আগে যেমন ছিল ভগবান—নিজের দায়িত্বটা তুলে দিতে। মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হলে অসহ্য লাগে বটে—কিন্তু বউ নামক একটা জিনিসের কাছে নিজের সবকিছু সঁপে দেবার মধ্যে একটা বেশ মজাও আছে।

হেমন্ত গভীরভাবে সুবিমলকে বললো, তুই এ সব সুনীলকে ভালো করে বুঝিয়ে দে! সুনীল শিগগিরই বিয়ে করছে।

সুবিমল চমকে উঠে বললো, তাই নাকি? গলায় গেরো পরছিস তাহলে? এঃ হে হে হে! সুনীলটাও গেঁজে গেল! বেশ ছিল ছেলেটা—মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো—হঠাৎ তার এই দুর্মতি! মেয়েটা কে? আমি চিনি?

হেমন্ত বললো, হ্যাঁ, দু'একবার দেখেছিস!

—সুনীল তো সেই একটা বাচ্চা মেয়ে—যমুনা না কি নাম যেন—তাকে নিয়ে কিছুদিন খুব মেতে উঠেছিল। কোথায় গেল সেই মেয়েটা? অনেকদিন দেখিনি মনে হচ্ছে।

—সে ওকে পাত্তা দেয়নি। এর নাম হচ্ছে মনীষা—

—ওঃ, আমাদের অরুণের বোন তো? খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে

তবে সুনীলের সঙ্গে একদম মানাবে না। মেয়েটার কোনো কুল কিনারা পাওয়া যায় না। কবে?

আমি বললাম, আমি বিয়ে করছি না। বিয়ে করছে হেমন্ত। ঐ মেয়েটিকেই।

হেমন্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আবার চ্যাংড়ামি হচ্ছে?

সুবিমল হাত তুলে বললো, দাঁড়া, দাঁড়া, জমাটি ব্যাপার মনে হচ্ছে।

মিস্ত্রিদের উদ্দেশ্যে সুবিমল বললো, মনসুর মিঞা, আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক্। সিমেন্টের বস্তাগুলোর দিকে একটু নজর রেখো—চুরি না হয়ে যায়—

হঠাৎ সুবিমল মনীষার কথা একদম ভুলে গিয়ে বাড়ির বিষয়ে কথা বলতে লাগলো। বাড়ি তৈরি করার সময় কেন নিজে দেখা-শুনো করতে হয়, কি ভাবে মালপত্র চুরি যায় এইসব।

তারপর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, মেয়েদের কথা সব সময় ভাবতে নেই। শরীর গরম হয়ে আয়ুক্ষয় হয় এখন দু'ঘণ্টা গ্যাপ দে। তারপর ঐ মেয়েটা সম্পর্কে ফয়সালা করা যাবে।

লাস্ট ট্রেন পৌনে এগারোটায়। সুবিমল তবু আজ আমাদের ছাড়বে না। ওর ভাড়া বাড়িতে গিয়ে আমরা বসলাম। বারান্দার প্রায় নীচেই একটা পানাপুকুর। তার ওপারে অনেকখানি সুপুরিবাগান। সুবিমল বললো, দেখিস, একটু বাদে সুপুরি-গাছের মাথায় চাঁদ উঠবে। এখানকার চাঁদ একেবারে অন্যরকম। সাইজে অনেক বড়, রংটাও নীলচে ধরনের। বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখিস নিজের চোখে। এই যে হাওয়া খাচ্ছিস না, খাঁটি বে অফ বেঙ্গলের হাওয়া।

হেমন্ত বললো, খাঁটি হাওয়া আমার সহ্য হয় না। একটু রাম-টাম জোগাড় কর তো!

সুবিমল বললো, রাম বোধহয় পাওয়া যাবে না। তাড়ি খাবি? আমি খাই, মাঝে মাঝে।

হেমন্ত বললো, না ওসব আমার চলবে না। গ্রামে এলেই তাড়ি আর বিড়ি—আমার দ্বারা হবে না! সুনীল খেতে পারে—

আমি বললাম, সুনীল বড় ভালো ছেলে। সে যাহা পায়, তাহাই খায়!

সুবিমল উঠে পড়ে বললো, দেখছি, কি পাওয়া যায়।

ইলেকট্রিক কানেকশান নেই, হ্যারিকেন জ্বলছে। বিশাল ঘরটায় আলো হয়েছে তাতে সামান্যই। আমি আর হেমন্ত পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে হেমন্তকে বললাম, তুই একবার বলেছিলি মনীষাকে আজ এখানে নিয়ে আসতে। যদি সত্যিই মনীষা আসতো —তা হলে আজ রাত্রে এখানে থাকা হতো না।

হেমন্ত ভুরু কুঁচকে বললো, মনীষাকে যদি জোর করতাম, ও থেকে যেত না আমাদের সঙ্গে?

—কে জোর করতো, আমি না তুই?

—সেটা একটা কথা বটে! কিংবা ওকে হয়তো জোর করতেই হতো না—ও নিজেই রাজি হয়ে যেত। ও তো হৈ চৈ করতে খুব ভালোবাসে। আমরা তো খারাপ কিছু করছি না!

—তবু ও থাকতো না! ওর পরীক্ষা সামনেই!

—ও তাই তো। তুই মনীষার সব খবর রাখিস।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমন্ত বললো, সুনীল, সত্যি করে বল তো, তুই কি চাস?

—আমি মনীষাকে বিয়ে করতে চাই না।

—তুই ওকে ভালোবাসিস না?

—আমি ওকে কখনো ভালোবাসার কথা বলিনি।

—মুখে বলার দরকার নেই।

—মনীষাকে আমি কখনো চিঠি লিখিনি।

—সে কথা হচ্ছে না—

—শোন হেমন্ত, মনীষা যদি কখনো কারুকে বিয়ে না করতো, তাহলেই আমি সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ঊষাদি বিয়ে করেননি। ওর বাড়ির সবাই মনীষাকে চাপ দেবে, তাছাড়া, মনীষা বিয়ে না করবেই বা কেন? এবং বিয়ে করলে তোকেই বিয়ে করা উচিত।

—কেন ?

—হেমন্ত, বুকে হাত দিয়ে বল্, তুই মনীষাকে ভালোবাসিস না ?

হেমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। মনীষাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। একটা দুর্লভ ধরনের মেয়ে। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারি না। আমি বোধহয় ওর যোগ্য নই—

—বাজে কথা বলিস না। প্রথম কথা, তোর হৃদয় আছে। তাছাড়া, তোর ভালো চাকরি, কলকাতা শহরে তোদের বাড়ি।

—মনীষার বাবার পছন্দ হয়েছে তোকে।

—রাস্কেল! ওর বাবার পছন্দে কি আসে-যায়! মনীষার মতামতটাই আসল।

—মনীষাও নিশ্চয়ই রাজি হবে।

—নাইনটি পার্সেন্ট মেয়েই বাবা-মা'র কথায় রাজি হয়। আমি সে-রকম চাই না।

—মনীষা সে-রকম মেয়েও নয়।

—তুই একটা কথার উত্তর দে তো। মনীষা তোকে তুমি বলে, আমাকে আপনি বলে কেন ?

—ওটা কিছু নয়। আমি অনেক বেশিদিন ধরে ওদের বাড়িতে যাই তো—আমাকে অনেক আগে থেকে চেনে। সেই তুলনায় তোকে তো—খুব বেশি দিন দেখেনি—কিন্তু তোকে ও খুব পছন্দ করে! কাকদ্বীপের সেই পিকনিকের কথা মনে নেই ?

কাকদ্বীপের পিকনিকে মনীষা আর সুজয়া রান্না করছিল ডাক-বাংলোর রান্নাঘরে। চৌকিদার রেঁধে দিতে পারতো, কিন্তু ওরা শখ করে গিয়েছিল। হেমন্ত খুব সর্দারি করছিল রান্নাঘরে গিয়ে। এটা ওটা মন্তব্য করছিল। সুজয়া আর মনীষা হেমন্তকে দিয়ে জল আনাচ্ছিল, পেঁয়াজ বাটাচ্ছিল। পেঁয়াজ বাটতে গিয়ে হেমন্ত কেঁদে কেটে অস্থির। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল সুজয়া! মনীষা ঠাট্টার ছলে ওর হলুদ-মাখা হাতের ছাপ দিয়ে দিয়েছিল হেমন্তর গালে।

হেমন্তও ওস্তাদ ছেলে। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক

আছে, আমি এ দাগ মুছবো না। এই কলঙ্কের ছাপ আমি শরীরে ধারণ করবো। এই অবস্থাতেই কলকাতায় যাবো।

সত্যিসত্যি হেমন্ত গালে সেই হলুদমাখা হাতের ছাপ নিয়ে ঘুরতে লাগল। স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হলুদের দাগ উঠতে চায় না সহজে। হেমন্তর লজ্জা নেই তাকে যে দেখছে সে-ই হাসছে। শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পড়লো মনীষা। ও নিজেই বার বার অনুরোধ করতে লাগলো, এই ধুয়ে ফেলুন, প্লীজ ধুয়ে ফেলুন। আর কক্ষনো দেবো না!

হেমন্ত কিছুতেই ধোবে না। বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার সময় সেই অবস্থা নিয়েই যখন হেমন্ত গাড়িতে উঠছে, তখন মনীষা ওর হাত টেনে ধরে বলেছিল, এই কি হচ্ছে কি? এবার ধুয়ে ফেলুন!

হেমন্ত বলেছিল, আমি কিছুতেই ধোবো না। যদি তুমি ধুয়ে দাও, তাহলে রাজি আছি।

নিজে সাবান মাখিয়ে হেমন্তর গাল থেকে সেই দাগ মুছে দিয়েছিল মনীষা। অবশ্য হেমন্তর চোখে সাবানের ছিটে লাগিয়ে দিয়েছিল ইচ্ছে করে।

হেমন্ত মুচকি হেসে বললো, হ্যাঁ, মনে আছে। আমার গালে এখনো যেন মনীষার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে।

আমার মনে পড়লো অন্য একটা কথা। হেমন্ত যখন ওদের সঙ্গে রান্নাঘরে, আমরা তখন অন্য একটা ঘরে তাস খেলছিলাম। হেমন্ত তাস খেলা পছন্দ করে না। হাসিঠাট্টা নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসে হেমন্ত, গম্ভীর হয়ে তাস খেলায় ও আনন্দ পায় না।

ব্রীজ খেলা হচ্ছিল, সেদিন খুব হারছিলাম আমি। একবার মনীষা ঢুকলো সেই ঘরে। মনীষা নিজেও ব্রীজ খেলা জানে, পয়েন্টস লেখা কাগজটা দেখে আমাকে বললো, এ মা, তোমরা হারছো?

তাসে হারলেই আমার মুখটা থমথমে হয়ে যায়। আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

মনীষা আমার পাশে বসে পড়ে বললো, ইস্, হেরে হেরে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে জিতিয়ে দিচ্ছি।

আমি মনীষাকে প্রায় একটা ধমক দিয়েই বললাম, এই, এখন

বিরক্ত করো না। এইবারটা না জিতলে মান-সম্মান থাকবে না।

মনীষা বললো, আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখো, তোমায় জিতিয়ে দিতে পারি কি না! আমি পাশে থাকলেই তুমি জিতবে।

সেবার তাস বিলি করা হয়েছে, আমার তাসগুলো আমি তখনো তুলিনি। মনীষা সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এবার তুলে দ্যাখো, কী রকম তাস পেয়েছো।

সেবার আমি ফোর নো ট্রাম্পস ডেকে রি-ডাবলের খেলা করছিলাম। খেলার মোড় ঘুরে গিয়েছিল সেবার থেকে। মনীষা একটু পরেই উঠে গেল আমার পাশ থেকে। যাবার সময় আমার পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বলে গেল, দেখলে, আমি তোমায় জিতিয়ে দিতে পারি কি না।

সুবিমল ফিরে এসে বললো, কি রে, তোরা এমন গুম মেরে বসে আছিস কেন?

সত্যিই, সেই আধো অন্ধকার ঘরে, হেমন্ত আর আমি বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলিনি। সিগারেট টানছিলাম নিঃশব্দে। বোধহয় আমরা দু'জনেই স্বপ্ন দেখছিলাম মনীষাকে।

মাছ ভাজা আর এক বোতল ব্রান্ডি এনেছে সুবিমল। সেগুলো নামিয়ে রেখে বললো, দোকানদারকে বলে এসেছি, আরও মাছ ভাজা দিয়ে যাচ্ছে।

—এখানকার দোকানে এত ভালো মাছ ভাজা পাওয়া যায় নাকি?

—না, না। বাজার থেকে মাছ কিনে একটা দোকানে ভাজিয়ে নিলাম। টাটকা ভেড়ির মাছ। এ'রকম স্বাদ কলকাতার মাছে পাবি না।

হেমন্ত বললো, তুই এখানে বাড়ি বানাচ্ছিস বলে এ-রকম জায়গা আর পৃথিবীতে কোথাও নেই মনে হচ্ছে। যাক গে, মাছগুলো সত্যিই ভালো।

আধবোতল ব্র্যান্ডি ফুরিয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর সুবিমল বললো, এইবার বল মেয়েটাকে নিয়ে তোদের প্রবলেম কি?

আমি বললাম, কোনো প্রবলেম নেই। হেমন্ত ওকে বিয়ে করবে।

—অসম্ভব।

—কেন, অসম্ভব কেন?

—আমি বিয়ে-টিয়েই করবো না—বেশ আছি। তা ছাড়া মনীষা সুনীলেরই প্রাপ্য।

—বাজে কথা বলিস না, হেমন্ত। তুই ভালোভাবেই জানিস মনীষাকে আমি পেতে পারি না। পেতে চাই না। আমি মনীষার ব্যর্থ প্রেমিকও নই। হেমন্ত, তুই-ই ওর যোগ্য।

সুবিমল বললো, একি ভাই, তোরা কি একজন আর একজনের ওপর গাছিয়ে দেবার চেষ্টা করছিস নাকি?

হেমন্ত বললো, ধ্যাৎ ইডিয়েট! তুই ভালো করে, মনীষাকে চিনিস না। মনীষার মতন মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

সুবিমল বললো, তোরা একটা মেয়েকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিস। বিয়ের আগে মেয়েদের একটু দেবী-টেবি মনে হয়, বিয়ের পর দেখবি মাইরি, সব এক। সেই শাড়ি-গয়না, বাপের বাড়ি যাবার বায়না—

—তুই মনীষাকে চিনিস না।

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বিচার করে দিচ্ছি। সুনীল তুই আগে বল, তুই কেন মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাস না—

আমি মাছের কাঁটা মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলাম। চুমুক দিলাম ব্র্যান্ডির গেলাসে। তারপর বললাম, এর দু'রকম কারণ আছে। প্রথম কারণটা তোকে বলবো না। তুই বুঝতে পারবি না! কিংবা, আমি না বললেও তুই বুঝতে পারবি। দ্বিতীয় কারণটা বলছি। মনীষা বেশ অবস্থাপন্ন ফ্যামিলির মেয়ে। ওর বাবা ওর জন্য একটা যোগ্য পাত্র চাইবেন—সেইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই তুলনায় আমি কি? একটু কবিতা লিখি, মামুলি চাকরি করি, আমাদের বাড়িতে এক্সট্রা ঘর পর্যন্ত নেই। তুই ভেবে দ্যাখ, হেমন্তই ওর ঠিক যোগ্য কিনা!

সুবিমল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনলো। খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলো। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, তুই

তাহলে ডগ ইন দ্য ম্যানজার হয়ে আছিস কেন? তুই মনীষাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দে—তারপর হেমন্ত যদি পারে, মানে তখন ব্যাপারটা অনেকখানি ইজি হয়ে যাবে—

সুবিমলের মুখে ডগ ইন দা ম্যানজার কথাটা শুনে আমার আঘাত লেগেছিল। এ ধরনের তুলনা ঠিক সম্মানজনক নয়। তবে ঐ কথাটা শুনেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, আমিই এই কাহিনীর ভিলেন। মনীষার সঙ্গে আমি যদি ভালোবাসার খেলা না খেলতাম, তাহলে হেমন্তর সঙ্গে ওর অনায়াসেই চমৎকার মিল হতে পারতো। হেমন্তর দিক থেকে অন্তত কোনো দ্বিধা থাকতো না। কিন্তু আমিই বা কি করবো, মনীষাকে না চিনলে আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। আমি বোধহয় তাহলে অফিসে ঘুষ নিতাম, চাকরির উন্নতির জন্য মন দিতাম, আমার অধঃপতনের পথ সরল হয়ে যেত।

হেমন্ত সুবিমলকে বললো, তুই চুপ কর। কিছু বুঝবি না। মনীষা যদি একটু সাধারণ মেয়ে হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই থাকতো না। এমন কি মনীষা আমাদের দু'জনের একজনকেও ভালোবাসে কিনা তাও জানি না। সবটাই হয়তো আমাদের মনগড়া।

আমি বললাম একটা জিনিস মনগড়া নয়। মনীষার বাবা তোকে ডেকে বিয়ের কথা বলেছেন।

হেমন্ত হঠাৎ রেগে গেল। নেশার ঝোঁকে আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে বললো, শালা, ফের ঐ কথা! আমি কারুর বাবার কথা শুনে বিয়ে করবো? আমি আমার নিজের বাবা-মা'র কথাই শুনি না—আর একটা মেয়ের বাবা মা'র কথা শুনবো?

আমি বললাম, হেমন্ত, বড্ড জোরে লেগেছে আমার!

—জোরে লেগেছে? তোকে আবার মারবো!

—মার!

—মারবোই তো! মনীষা আমার কেউ নয়, মনীষা তোর।

—একথা বললে তোকেও আমি মারবো।

আমি ঝুঁকে বেশ শব্দ করে একটা চড় ঝাড়লাম হেমন্তকে। সুবিমল আঁতকে উঠে বললো, এই তোরা কী শুরু করলি রে? একটা মেয়ের জন্য মারামারি!

হেমন্ত হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। সুবিমলের থুতনি ধরে বললো, তুই বুঝবি না। আমরা কেন মারামারি করছি, তুই বুঝবি না। বড় কষ্ট রে সুবিমল।

সুবিমল বললো, একটা মেয়ের জন্য দুই বন্ধু মারামারি করতে পারে কিংবা হাসতে পারে—এটা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হতো সব মেয়েই মেয়ে! শুধু কারো স্বাস্থ্য ভালো আর কারো স্বাস্থ্য খারাপ—এইটুকুই যা তফাৎ। বিয়ে করলে বোধহয় এই রকমই মনে হয়।

আমার মনে পড়লো মনীষা স্বপ্নের মধ্যে বলেছিল বিয়ের পর সব কিছুই কি রকম অভ্যেস হয়ে যায়। এর নামই কি ভালোবাসা?

সুবিমল বিষণ্নভাবে বললো, আমি বিয়ে করে তোদের থেকে আলাদা হয়ে গেছি, না রে? আমাকে তোরা আর দলে নিবি না?

হেমন্ত সে কথা গ্রাহ্য করলো না। আমার পা দুটো চেপে ধরে কান্নাকান্না গলায় বললো, সুনীল, মনীষাকে অন্য কোথাও যেতে দিস্ না। মনীষাকে অন্য কেউ নিয়ে যাবে—আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। ও অন্তত আমাদের মধ্যেই থাক। মনীষাকে তোরই পাওয়া উচিত।

হঠাৎ একটা দারুণ মিথ্যে কথা বলার ঝোঁক এসে গেল আমার মধ্যে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলুম না। আমি শুকনো মুখ করে বললুম, তাহলে শোন, তোকে সত্যি কথাটা বলি। আমি মনীষাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। মনীষা রাজি হয়নি। মনীষা আমাকে চায় না, আমি আগেই জেনে গেছি।

আমার কখনো খুব কঠিন অসুখ হয়নি, কিন্তু একবার আমি মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি দেখেছিলাম।

বছর ছয়েক আগে কলকাতা থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের নামটা ভুলে গেছি। তবে

সেখানে একটা মস্ত বড় দিঘি আছে, যার নাম সেন দিঘি—লোকে বলে রাজা লক্ষণ সেনের আমলে নাকি দিঘিটা কাটানো হয়েছিল। গ্রামের কয়েকটি ছেলে বললো, ঐ দিঘি কেউ এপার-ওপার করতে পারে না। কী যেন একটা অলৌকিক গল্প আছে সে সম্বন্ধে।

এইসব কথা শুনলেই চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছে করে। বন্ধুদের কথায় গ্যাস খেয়ে আমি বললাম, আমি এপার-ওপার করবো—কি দেবে বলো ?

আমার জন্ম পূর্ব বঙ্গে, সাঁতার শিখেছি সহজাতভাবে। অনেক দিন অভ্যেস নেই, কিন্তু সাঁতার কেউ কখনো ভোলে না। আমি স্পীড তুলতে পারবো না, কিন্তু যথেষ্ট সময় পেলে আস্তে আস্তে সাঁতরে যাওয়া কি আর শক্ত ? মাঝে মাঝে হাত পা ছেড়ে চিৎ হয়ে ভেসে থাকলেই হবে।

যাবার সময় ঠিকই চলে গেলাম। দিঘিটার পারে দাঁড়িয়ে যত বড় মনে হয়, আসলে তার চেয়েও বড়, জল বেশ ভারী। বন্ধুরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত-তালি দিচ্ছিল। হাততালির নেশায় মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। যদিও পুকুরের মাঝামাঝি এলে পারের আওয়াজ কিছুই শোনা যায় না।

যাই হোক, পার হয়ে ওপারে পেঁছুলাম—সেখানে ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। বুকের মধ্যে হাঁসফাঁস করছে। বহুদিন অনভ্যাসে দম নেই। ওপারে বন্ধুদের চেহারা ছোট ছোট দেখাচ্ছে। এপার জনশূন্য, একটা ভাঙা শিবমন্দির, একটা কুবো পাখি অনেকক্ষণ ধরে ডেকে যাচ্ছে একটানা।

ঘাটের সিঁড়িতে বসে বিশ্রাম নিতে নিতে খুব মনে হতে লাগলো, আর সাঁতরে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। এবার পার দিয়ে হেঁটে যাই। হাত-পাগুলো অবশ লাগছে। কিন্তু বাজিতে হেরে যাবার ব্যাপারটা মনে হতেই আবার অনেক যুক্তি এসে যায়। আস্তে আস্তে চিৎ-সাঁতার কাটলে দম বেশি লাগবে না। ফেরার সময় আরও আস্তে আস্তে যাবো। ওপার থেকে একজন কেউ নাম ধরে ডাকতেই আমি আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ফেরার পথ সব সময়ই দীর্ঘতর হয়। তা ছাড়া, এবার জলে

নেমেই মনে হলো, আমি কি নির্বোধ, সামান্য বাজির জন্য শরীরকে এ'রকম কষ্ট দিচ্ছি। বহুদিন অনভ্যাসের ফলে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। খানিকটা এসে খুব ইচ্ছে করতে লাগলো ফিরে যাই। হার স্বীকার করি! কিন্তু তখন ফিরতে গেলে বেশি সময় লাগবে না পৌঁছুতে—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। মনে হয়, মাঝখানে এসে গেছি, দু' দিকেই সমান দূর।

সেই সময় নিজেকে কী ভীষণ একা লাগলো। ক্লান্ত হয়ে, চিৎ-সাঁতার কাটছিলাম, চোখের সামনে শুধু আকাশ—বহুদিন এ'রকম আকাশ দেখিনি। এখন কেউ আমাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে না। এতবড় একটা দিঘির মাঝখানে আমি একা। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, দূরে বন্ধু-বান্ধবরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ব্যস্ত, আমার দিকে কারুর নজর নেই।

সেই মুহূর্তে সেন দিঘি সম্পর্কে প্রবাদ সত্যি হয়ে ওঠার উপক্রম হলো। আমি দম ফুরোবার ভয় করছিলাম, কিন্তু আমার হাতে পায়ে খিল ধরে গেল। বাঁ দিকে পা ও হাত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যাবার মতন, আর নাড়াতে পারছি না। দিঘির অতল আমাকে টানছে, আমি ডুবে যাচ্ছি। চিৎকার করে উঠেছিলাম, অবিনাশ, অবিনাশ, আমাকে বাঁচা।

কেউ শুনতে পায়নি আমার চিৎকার। কিংবা হয়তো আমার গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরোয়নি। আস্তে আস্তে ডুবে যেতে যেতে আমি বুঝতে পারলাম, মৃত্যু খুব কাছে। মৃত্যুর চেহারা নীলরঙা জলের মতন। রাশি রাশি স্তব্ধ নীল জল আমাকে ঘিরে ধরেছে—কী অসম্ভব জোরে চিৎকার করার ইচ্ছে হয় তখন, অথচ উপায় নেই, হাত পা ছুঁড়তে ইচ্ছে হয়—অথচ আমি শৃঙ্খলিত মানুষের মতন বন্দী। কী সাংঘাতিক অসহায় একাকীত্ব!

বলাই বাহুল্য, সেবার আমি মরিনি। এই লেখা তো আমি ভূত হয়ে লিখছি না। বেশির ভাগ মৃত্যুই যেমন দুর্ঘটনা, বেঁচে ওঠাও সেইরকম। দিঘিটা খুব বেশি গভীর ছিল না—দু'-আড়াই মানুষ হবে। ডুবে গিয়ে তলার মাটিতে পা ঠেকানো মাত্র আমার হাত পায়ের খিল ছেড়ে যায়, প্রাণপণ শক্তিতে আমি আবার ঠেলে

ওপরে উঠেছিলাম। তারপর বাকি অংশটা সাঁতরে গেছি অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে—বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণ যত জোরে ছোটে। ফিরে যাবার পর বন্ধুরা কেউ আমার কথায় বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল, আমার কৃতিত্বকে আমি বেশি রোমাঞ্চকর করে তুলছি।

কিন্তু রাশি রাশি নীল জল মৃত্যুর মতন আমাকে ঘিরে ধরেছে—এই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। জীবনের নানা সংকট সময়ে এই দৃশ্যটা ফিরে আসে। টের পাই অসহায় একাকীত্ব।

সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গি দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার প্যান্টসার্ট ফর্সা। আমার পকেটে কুড়ি পঁচিশটা টাকা আছে। চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষ, সিনেমা হলে উজ্জ্বল আলো, কত দোকানের হাতছানি—কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষের মতন আমি হেঁটে যাই। আমার চারপাশে মৃত্যুর নীল জলরাশি। আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না!

নিজেই এক এক সময় বুঝতে পারি, এটা আমার মনগড়া দুঃখ। দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা যাকে বলে। কেউ অভিযোগ করলে আমি অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ সুখ বা কোন্ দুঃখটা মনগড়া নয়? এমনকি খেতে না পাওয়ার দুঃখও মনগড়া। লছমনঝোলায় আমি একজন সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম, সারাদিনে যার খাদ্য মাত্র একখানা রুটি ও দুটি ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ এবং চার পাঁচ কমণ্ডলু ভর্তি জল। দিনের পর দিন তাঁকে ঐ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছি। উনি বলতেন, উনি নাকি জল থেকেই সমস্ত খাদ্যগুণ পেয়ে যান। ক্যালোরি ও ফুডভ্যালুর সমস্ত তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে সেই সাধুজী এক মনগড়া ভগবানকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছেন।

পৃথিবীর সমস্ত গরীব লোক মাত্র একখানা রুটি ও ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, একথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কেননা, আমি নিজেও তা পারি না। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, পৃথিবীর অনেক সুখের মতন, অনেক বাস্তব দুঃখও মনগড়া।

চৌরঙ্গি ছেড়ে আমি ময়দান দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করে যাচ্ছি অন্যমনস্ক-

ভাবে। হঠাৎ এখানে আমার চেনাশুনো কেউ আমাকে দেখলে অবাক হবে। আমি আড্ডা ও হৈ-হল্লায় থাকার মানুষ। আমি একলা একলা ময়দানে ঘুরছি—আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! মানসিক একাকীত্বের সঙ্গে সমতা রাখার জন্যই আমার এই শারীরিক একাকীত্ব। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

আমি মনীষাকে ভালোবাসি, অথচ তাকে কখনো নিজের করে চাইনি। এর কোনো মানে হয়? আমি মনীষাকে সব সময় খুঁজছি, অথচ বৌবাজারের মোড়ে তাকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কি এর রহস্য? আমি নিজেই আমার নিজের ব্যবহারের মর্ম বুঝি না। অন্য মানুষের চরিত্র আমি কি করে বুঝবো? আমি লেখক না কচু! আমি কিছু জানি না। একা একা বিনা উদ্দেশ্যে এ'রকমভাবে তো আমার ময়দানে ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়! ধরা যাক, এই বিশাল অন্ধকার ময়দানে কোথাও একটা সূঁচ পড়ে আছে, আমাকে সেটা খুঁজে বার করতে হবে।

···এক টুকরো নতুন সাদা কাপড়ের ওপর পেন্সিল দিয়ে গোলাপ ফুল আঁকা। মাটিতে পা ছড়িয়ে মনীষা সেলাই করতে বসেছে। সূঁচ ও সুতোর দিকে দারুণ মনোযোগ। বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছে সুজয়া।

এই, অরুণ কোথায়? অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছি, শুনতে পাচ্ছো না?

ধড়মড় করে উঠে বসলো সুজয়া। আমাকে দেখে বললো, ও তো ফেরেনি এখনো?

—ফেরেনি? সাতটার সময় ওর বাড়িতে থাকার কথা! এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।

—আমাকে তো কিছু বলেনি। ভুলেই গেছে বোধহয়।

—ইস্, অরুণটা এমন জ্বালাতন করে!

মনীষা মুখ তুলে বললো, এত ছট্‌ফট্ করছো কেন? কোথায় যাওয়ার কথা আছে?

—জাহাজে।

জাহাজে মানে?

পোর্ট কমিশনার্স-এর একটা জাহাজের চীফ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বন্ধু! সে আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। অরুণকে সাতটার সময় বাড়ি থেকে তুলে নেবার কথা—

সুজয়া বললো, আপনারা জাহাজে উঠবেন। আমরা বুঝি সেখানে যেতে পারি না?

—না, জাহাজে মেয়েরা যায় না।

—কেন, মেয়েরা কি দোষ করলো?

—তা জানি না। মোটকথা আমার বন্ধু মেয়েদের নিয়ে যাবার কথা বলেনি।

আপনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের কথা? করেননি। এসব প্রোগ্রামের সময় আমাদের কথা মনেই থাকে না।

—তোমরা জাহাজে গিয়ে কি করবে? আমরা সেখানে একটু বিলিতি হুইস্কি-টুইস্কি খাবো, হৈ-চৈ করবো।

—বাঃ আপনারা জাহাজে গিয়ে হৈ-চৈ করবেন, আর আমরা বাড়িতে বসে থাকবো? কেন আমরা বুঝি হৈ-চৈ করতে পারি না!

—আচ্ছা, না হয় আর একদিন বলে দেখবো। অরুণটাকে নিয়ে তো মহা মুস্কিল হলো!

মনীষা আবার সেলাইয়ে মনোযোগী হলো। ফের মুখ তুলে বললো, একটু বসো, দাদা হয়তো এসে পড়বে।

—বসবো কি? নিচে ট্যাক্সিতে আরও দু'জন ওয়েট করছে।

—কে? তাদেরও এসে বসতে বলো।

—তোমরা তাদের চেন না।

—তাহলে ওদের চলে যেতে বলে দাও।

—না, আমিও ওদের সঙ্গে চলে যাবো। সাড়ে সাতটার মধ্যে না পৌঁছলে—

— দাদা যদি না আসে, তাহলে দাদাকে ফেলেই চলে যাবে?

—অরুণের যদি এত ভুলো মন হয়, তা হলে আমি কি করতে পারি!

—তুমি যেও না।

মনীষার কথায় আমি থমকে গেলাম। মনীষা তো কখনো

এ'রকম ভাবে বলে না। আমি মনীষার চোখের দিকে তাকালাম। মনীষাও সোজা আমার দিকে চেয়ে আছে। আর একবার বললো, তুমি যেও না! জাহাজের প্রোগ্রামটার ব্যাপারে আমার খুবই উৎসাহ ছিল। কে যেন তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল।

সুজয়া বললো সত্যি, আমাদের বাদ দিয়ে আপনারা যাবেন, এর কোনো মানে হয় না। আমি কখনো কোনো জাহাজের ভেতরে ঢুকিনি। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আর একদিন ব্যবস্থা করুন, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যাবো।

—অরুণ এখনো ফিরলো না কেন? অফিস থেকে আর কোথাও গেছে নাকি?

—কি জানি। আমাকে কি আর সব কথা বলে।

মনীষা আবার মুখ নিচু করে শেলাই করছে। ও যেন ভালো করেই জানে, ওর যেও না শুনে আমি কিছুতেই যাবো না। সেই জন্যই আমি নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, না ভাই, কথা দেওয়া আছে, আজ আমি যাই। আর একদিন না হয় তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো।

মনীষা মুখ না তুলেই বললো, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!

আমি ওকে এক ধমক দিয়ে বললাম, ভালো হবে না মানে। অরুণ দেরী করছে বলে কি আমি যাবো না? নিশ্চয়ই যাবো!

—ঠিক আছে, তুমি গিয়ে দেখো।

সুজয়া হাসতে লাগলো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমিও আজ তোমাদের মজা দেখাচ্ছি!

ট্যাক্সিতে অপেক্ষমান বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেড়ে দিলাম। ওপরে ফিরে এসে আফশোসের সুরে বললাম, আজ অরুণের জন্য আমার প্রোগ্রামটা নষ্ট হলো। জাহাজে ওরা ডিউটি-ফ্রি জিনিস পায়—

সুজয়া বললো, বসুন। আপনাকে ফিস ফ্রাই খাওয়াচ্ছি। আপনারা বাইরে বাইরে প্রোগ্রাম করবেন—আমাদের কি করে সময় কাটে বলুন তো। আপনার বন্ধু তো আজকাল একদিনও সন্ধ্যের

পর বাড়ি ফেরে না। সব আড্ডা বাইরে বাইরে। বাড়িতে আর যেন ফিরতে ইচ্ছেই করে না!

—সে কি, তুমি বাড়িতে একলা একলা থাকো?

—বিয়ের দু'এক বছর পর সব ছেলেরাই এ'রকম হয়ে যায়!

মনীষা মনোযোগ দিয়ে সেলাই করছে। আমাকে বললো, তুমি যেও না, অথচ এখন আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি ধমক দিয়ে বললাম, এই মনীষা, তুমি রাত্তিরবেলা সেলাই করছো কেন? চোখ খারাপ হয় ওতে।

—কাল আমার এক বন্ধুর জন্মদিন। তাকে দিতে হবে।

আমি জানি, মনীষা কোনো বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা জন্মদিনের নেমন্তন্নে সাধারণত কেনা জিনিস উপহার দেয় না। নিজের হাতে কিছু বানিয়ে দেয়। সেইজন্য ওর উপহারের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্পর্শ থাকে।

—তা হোক। কাল সকালে সেলাই করো। রাত্তিরে না—

—কাল সকালে শেষ হবে না—

সুজয়া বললো, পরশু হেমন্তদা আমাদের একটা সিনেমা দেখালেন। নাইট অব দা ইগুয়ানা। আর একটি মেয়ে ছিল ওর সঙ্গে। আপনি বইটা দেখেছেন?

আমি বললাম, হেমন্তটা পাজী আছে তো! আমাকে বলেনি!

—আপনাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল।

—মনীষা, তুমি গিয়েছিলে?

সুজয়া উত্তর দিল না, মধুবন যায় নি। ওর কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। আজ আপনি একটা সিনেমা দেখান না! নাইট শো-তে।

—আজ? অরুণের তো এখনো পাত্তাই নেই।

সুজয়া দুষ্টুমী করে বললো, ও থাক না। চলুন, আমি আপনি আর মধুবন চলে যাই। ও এসে দেখবে ঘরে তালাবন্ধ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তালাবন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে আর কেউ নেই?

—না। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই সোনারপুর গেছেন। কাল ফিরবেন।

সোনারপুরে অরুণদের একটা বাড়ি আছে। ওর বাবা-মা সেখানে যান মাঝে মাঝে।

সুজয়া অভিযোগ করে বললো, দেখুন না, আজ বাড়ি ফাঁকা—তবু ওর বাড়ি ফেরার নাম নেই। আজ ওর শাস্তি পাওয়া উচিত—চলুন আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

—ঠিক আছে, চলো! তৈরি হয়ে নাও। এই মনীষা ওঠো!

—ভ্যাট। এইরকম ভাবে যাওয়া যায় নাকি? দাদাকে না বলে—

সুজয়া জোর দিয়ে বললো, কি হয়েছে তাতে? তোমার দাদা একদিন বুঝুক। রোজ কোথায় তাস খেলতে যায়—দশটা এগারোটায় ফেরে—

আমি বললাম, পুরুষ মানুষের বেশি সময় বাড়িতে থাকা ভালো নয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আজ যদি একান্তই অসুবিধে হয় কাল সিনেমায় যাবে? এলিটে একটা খুব নাম করা ফ্রেঞ্চ বই এসেছে। কালই শেষ।

—মনীষা যাবে তো?

—আমি যাবো না। তোমরা যাও। কাল আমার এক বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন—

—নাইট শো-তে যাবো। তার আগে তুমি নেমন্তন্ন সেরে এসো।

—সত্যি, তা হবে না! ওর বাড়ি সেই নিউ আলিপুরে। অতদূরে যাওয়া-আসা—

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কাল তোমাকে ঐ নেমন্তন্নতে যেতে হবে না।

মনীষা মুখ তুলে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। ও বরের সঙ্গে বিলেত চলে যাচ্ছে। কাল না গেলে আর দেখাই হবে না ওর সঙ্গে। আমি ওকে কথা দিয়েছি।

একটু আগে ও আমাকে বললো, তুমি যেও না। এখন আমি ওকে এক জায়গায় যেতে বারণ করছি, ও শুনবে না। এ মেয়েকে নিয়ে পারা যায়? মনীষা কি আমাকে নিয়ে খেলা করছে? নাকি বেশি ব্যক্তিত্ব দেখাচ্ছে? বেশ রাগ হলো। ইচ্ছে হলো, টান মেরে ওর সেলাইয়ের জিনিসপত্র ফেলে দিই—

সুজয় বললো, মধুবন না গেলে বুঝি আমাকে দেখাবেন না ? আমার তো কাল নেমন্তন্ন নেই। আমি কি দোষ করলুম ?

আমি সুজয়ার হাত ধরে বললাম, তাহলে চলো, আজই যাই। তুমি আর আমি। চলো এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবো।

মনীষা বললো, বৌদি তুমি যাও না। আমি দাদাকে খাবার দিয়ে দেবো।

শেষ পর্যন্ত সুজয়ার সাহসে কুলোলো না। বললো, আপনার বন্ধু কিন্তু তাতে রাগ করবে না। কিন্তু কি করবে বলুন তো ? এই ছুতো পেয়ে, এরপর আরও দেরী করে বাড়ি ফিরবে।

আমি হতাশভাবে বললাম, তাহলে আর ফিস ফ্রাইটা মিস করি কেন ? তুমি যে বললে ফিস ফ্রাই খাওয়াবে ?

সুজয়া খাবার আনতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মনীষা একমনে শেলাই করে যাচ্ছে। সাদা কাপড়ে ফুটে উঠেছে গোলাপ ফুলের ডিজাইন।

আমি বললাম, তুমি যদি মন দিয়ে সেলাই-ই করবে শুধু, তাহলে আমাকে থাকতে বললে কেন ?

—এমনিই। ইচ্ছে হলো।

—এতক্ষণে আমি জাহাজে গিয়ে কত আনন্দ করতে পারতুম।

—সেইজন্যই তো।

—তার মানে ?

—তার মানে আর কিছু নেই।

—বাঃ, আমি শুধু শুধু বসে থাকবো, আর তুমি সেলাই করবে ?

—আমাকে যে এটা শেষ করতেই হবে।

এক টান দিয়ে আমি সেলাইয়ের কাপড়টা সরিয়ে নিলাম। মনীষা বললো, উঃ আমার আঙুলে সুঁচ ফুটিয়ে দিলে তো !

সত্যিই মনীষার তর্জনীর ডগায় একবিন্দু রক্ত। মনীষা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে। ওর সুচারু আঙুলে ঐ রক্তের বিন্দু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বিন্দুটা আস্তে আস্তে ফোঁটা হলো।

আমি বললাম, দেখি আঙুলটা।

—কেন ?

—রক্ত নষ্ট করতে নেই। আমি খেয়ে ফেলছি ওটা।

—ভ্যাট ! অন্যের রক্ত খায় নাকি ?

—আমি খাবো। আমি কখনো মেয়েদের রক্ত খাইনি ! স্বাদটা কি রকম দেখি তো—

খানিকটা অনিচ্ছায় খানিকটা কৌতূহলে মনীষা আঙুলটা বাড়িয়ে দিল। আমি সেটা মুখে দিলাম। মুখ থেকে যদি আর বার না করি ?

—কি রকম স্বাদ ? অন্য রকম ?

—রক্তের ? না তোমার আঙুলের ?

—থাক, বলতে হবে না।

—এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার একটা রক্তের সম্পর্ক হয়ে গেল, জানো তো ?

মনীষা হাসলো। আমি বললাম, আমার আর একটা শখ আছে। তোমার চোখের জল একদিন একটু টেস্ট করে দেখবো। মেয়েদের চোখের জলের স্বাদ কী রকম হয় সেটা আমার জানতে ইচ্ছে করে। তুমি কখন-কেঁদে ফ্যালো বলো তো ?

মনীষা এবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ক'দিন আগে একটা উপন্যাস পড়ছিলাম, তার একটা লাইন হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—কি লাইন ?

—তাতে এক জায়গায় আছে, একটা মেয়ে বলছে, 'আমার কান্না দেখতে পাওয়া যায় না।' আমারও ঐ লাইনটা বলতে ইচ্ছে করছিল —কিন্তু হয়তো ওটা সত্যি নয়। সত্যি না হলেও অনেক কথা এক এক সময় বলতে ইচ্ছে করে, তাই না ?

—আমি তোমাকে এক্ষুনি কাঁদিয়ে দিতে পারি।

—সে আর এমন শক্ত কি ? চোখের সামনে কমলালেবুর খোসা টিপে দিলে কিংবা হঠাৎ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিলে চোখে জল এসে পড়ে। কিন্তু সেটা তো সত্যিকারের কান্না নয়।

—সে রকম নয়। সত্যিকারের কান্না। সে রকম কান্না বুঝি

তোমার বেরোয় না ?

—অনেক দিন সে রকম ভাবে কাঁদিনি বোধহয়। ঠিক মনে পড়ছে না।

—আমি তোমাকে সে রকম কাঁদিয়ে দিতে পারি।

—পারবে না। —এই, তা বলে মেরো না যেন আমাকে। তুমি বড্ড মারো—। আর একবার সেই মেরেছিলে, ময়দানে—

—তোমার মনে আছে সে কথা ?

—মনে থাকবে না ?

—তোমাকে দেখলে এক এক সময় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

—এখন মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! আমি তাহলে চলে যাচ্ছি—

মনীষা সত্যি সত্যি উঠে পড়লো! আমি হাত ধরে ওকে আটকাতে গেলাম, ওর হাত থেকে সেলাইয়ের জিনিসগুলো পড়ে গেল।

মনীষা বললো, এই যাঃ! সুঁচটা হারিয়ে ফেললে তো ? কি হবে এখন ?

—হারাবে কোথায় ? আমি খুঁজে দিচ্ছি !

—দাও, খুঁজে দাও।

সারা ঘরময় আমি সুঁচটা খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, খাটের নিচে একটু একটু অন্ধকার···আমি সুঁচ খুঁজছি···

চীনে দোকানে ক্যাবিনের নম্বর জানিয়ে হেমন্ত আমাকে টেলিফোন করেছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, হেমন্তর সঙ্গে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটি বেশ লম্বা, মুখখানা ঢলঢলে, চড়া হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ী পরে আছে। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, ভুরুতে কাজল।

হেমন্ত বললো আয়, সুনীল। আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম হচ্ছে সান্ত্বনা। সান্ত্বনা চক্রবর্তী। আর এ হচ্ছে···

ক'দিন ধরেই শুনছিলাম, হেমন্তকে প্রায়ই একটি মেয়ের সঙ্গে পথেঘাটে, সিনেমায় দেখা যাচ্ছে। সুবিমলের কাছে যেদিন গিয়েছিলাম তারপর থেকে হেমন্ত আমাকে এড়িয়ে চলছে। আমি চেষ্টা করে ওকে ধরতে পারিনি, আজ নিজে থেকেই আমাকে টেলিফোন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। হেমন্তকে আমি চিনি বছর দশেক ধরে। অথচ এই মেয়েটিকে আমি কোনোদিন দেখিনি।

হেমন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে বললো সান্ত্বনা খুব ভালো গান করে। রেডিওতে চান্স পেয়েছে! একদিন অ্যারেঞ্জ করতে হবে, সান্ত্বনার গান শোনার জন্য!

আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—সান্ত্বনার সঙ্গে আমার খুব ছেলেবেলায় আলাপ ছিল মুঙ্গেরে। অনেকদিন বাদে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হেমন্ত আর সান্ত্বনা টেবিলের একদিকে পাশাপাশি বসে আছে। কোনো মেয়ের সঙ্গে এরকমভাবে বসা একটু বিসদৃশ। আমি বসেছি বিপরীত দিকে। হেমন্ত কথা বলার সময় সান্ত্বনার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। বোঝা যায়, অনেকদিন বাদে হঠাৎ দেখা হলেও হেমন্তের সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অনেকখানি।

হেমন্ত বললো, বুঝলে সান্ত্বনা, এই যে সুনীল, এ হচ্ছে আমার অনেক দিনের বন্ধু। এর সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না।

সান্ত্বনা হেসে বললো, বাঃ, খারাপ ব্যবহার করবো কেন?

—তোমাদের মেয়েদের একটা খারাপ অভ্যেস আছে। একজনের সঙ্গে বেশি ভাব হয়ে গেলে অন্যদের আর পাত্তাই দিতে চাও না!

সান্ত্বনা লাজুকভাবে বললো, বাঃ!

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। হেমন্তর অতিরিক্ত উৎসাহের মানে বোঝা যাচ্ছে না। হেমন্ত একটা কিছু নতুন খেলা খেলতে চাইছে। হেমন্তের উদ্ভাবনীশক্তির শেষ নেই।

এক গাদা খাবারের অর্ডার দিয়েছে হেমন্ত। আমার সামনেই

সান্ত্বনাকে মৃদু আদর করে ফেলছে মাঝে মাঝে। সেই সঙ্গে আবোল তাবোল গল্প। হঠাৎ বললো, সান্ত্বনাকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম, জানিস তো ? সবাই মিলে একসঙ্গে সিনেমায় গেলাম। মনীষা কিছুতেই গেল না। এত করে যেতে বললাম—। যাই বল, মনীষার বড্ড ডাঁট।

তারপর সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললো, সেদিন যে মনীষাকে দেখলে—ওর সঙ্গে সুনীলের খুব ভাব। খুব ভাব—বুঝলে তো।

সান্ত্বনা বললো, ওকে খুব সুন্দর দেখতে।

—কাকে ?

—ঐ মেয়েটিকে। যার নাম মনীষা—

—সুনীলকেই বা এমন কি খারাপ দেখতে ? খুব খারাপ বলা যায় না। সুনীলের সঙ্গে ওকে মানাবে না ?

আমি চোখ সরু করে তাকিয়ে রইলাম হেমন্তর দিকে। হেমন্ত আমাকে কথা বলার কোনো সুযোগই দিচ্ছে না।

হেমন্তর কথা শুনতে শুনতে আমি সান্ত্বনাকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। মেয়েটি বারবার চকিতে একবার হেমন্ত একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। শরীরের তুলনায় ওর মাথার খোঁপাটা মস্ত বড়। হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা—কে যেন বলেছিল আমাকে, শিল্পীদের আঙুল এ'রকম লম্বা হয়। টেবিলের তলায় মেয়েটি ঘন ঘন পা নাচাচ্ছে। তার শাড়ী ও পোশাকের তুলনায় চটির অবস্থা বেশ খারাপ। আমার দৃঢ় ধারণা খোঁপার তলায় ওর ঘাড়ে ময়লা জমে আছে।

মেয়েটির জন্য আমার হঠাৎ খুব দুঃখ হলো। ওর কোনো দোষ নেই। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছিলাম, হেমন্ত কিছুতেই ছাড়লো না। হেমন্ত প্রায়ই একটু গদগদ ভাব দেখিয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে আলাদা কথা বলছে ফিসফিস করে—অথচ আমাকে চলে যেতেও দেবে না। কোনো মেয়ের সঙ্গে এ রকম ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে তৃতীয় ব্যক্তি তখন অবাঞ্ছিত। হেমন্তর উচিত ছিল আমাকে কাটিয়ে

দেওয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, হেমন্ত আমাকে এসব দেখাতেই চায়। সান্ত্বনা বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত। হেমন্ত ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চায়—কিন্তু সান্ত্বনা বাসে যাবে। বাসে উঠবার আগে হেমন্ত আর সান্ত্বনা আবার কিছুক্ষণ আলাদা কথা বললো, আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সান্ত্বনা বাসে উঠে যাবার পরও হেমন্ত একটুক্ষণ সতৃষ্ণভাবে বাসটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধহয় ওর হাত নাড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সান্ত্বনা বসবার জায়গা পায়নি, তাকে আর দেখা গেল না।

তখন হেমন্ত আমার দিকে ফিরে বললো, দারুণ গান গায়, বুঝলি। শুনলে তুই ফ্ল্যাট হয়ে যাবি।

—তুই শুনেছিস ওর গান? কোথায় শুনলি?

—আমার মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা হলো। সেখানেই ও গান গাইছিল। পরদিন ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আলাদা দেখা করলাম।

—এর মধ্যেই তোর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে, তুই ওকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গেলি?

—এত ভাব মানে কি? ওর সম্পর্কে আমি এত অ্যাট্রাকটেড হয়ে গেছি যে, চোখ বুজলেই এখন ওর মুখটা দেখতে পাই।

আমি হেমন্তর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। হেমন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বললো, ক্যাবলার মতন হাসছিস কেন?

হেমন্ত, তোর মামাতো বোন অসীমার এক বন্ধু ছিল, কি যেন তার নাম? ও, হ্যাঁ, নন্দিনী। সেই নন্দিনী এখন কোথায় থাকে?

—কি জানি, খবর রাখি না। হঠাৎ তার কথা কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি। নন্দিনীর বেশ দুর্বলতা ছিল তোর সম্পর্কে।

—এক সময়ে অনেক মেয়েরই দুর্বলতা ছিল আমার সম্পর্কে! আমি তো তোর মতন ফালতু নই। আমার সি এ ডিগ্রি আছে।

—হঠাৎ যদি তোর মেয়েদের সঙ্গে মেশার ঝোঁক চাপে, তাহলে নন্দিনীর মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশাই তো ভালো।

—কেন, সান্ত্বনাকে তোর পছন্দ হলো না। চোখ দুটো কী সুন্দর, তুই লক্ষ্য করিস নি?

—দ্যাখ, মনীষাকে ভোলার চেষ্টা করতে গেলে এই সান্ত্বনা খুবই পুয়োর সান্ত্বনা। এর নামটাও খুব সিগনিফিকেন্ট, তুই লক্ষ্য করেছিস?

—তুই রাখ তো! তোর ধারণা মনীষার মতন সুন্দরী আর কেউ নেই! ও রকম মেয়ে ঢের দেখা যায়। কী আছে মনীষার? চোখ খারাপ—চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে পায় না! কপালটা ছোট—

—গায়ের রং তেমন ফর্সা নয়—

—কখনো সীরিয়াস হতে জানে না। সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি করে—

—বাড়িতে থাকে না। টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়—

—ছেলে-ঘেঁষা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেশে—

—মনীষার আরও অনেক দোষ আছে। আয়, মনীষার দোষগুলোর একটা লিস্ট বানাই।

—আমার দরকার নেই। নট ইন্টারেস্টেড—

—হেমন্ত, তুই হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন রে? মনীষার বাবা কি তোকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন? সেইজন্যই তুই সান্ত্বনাকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলি?

—মনীষার বাবাকে আমি বলে দিয়েছি, আমি ইন্টারেস্টেড নই।

—তোর কত টাকা খরচ হচ্ছে রে?

—কিসের টাকা খরচ?

—সান্ত্বনা খুব গরীব ঘরের মেয়ে। ওকে টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে হয়, তাই না?

—তার মানে, তুই ওকে চিনতিস আগে থেকে?

—না, চিনতাম না। তবে ওর টাইপটা চিনি।

—তুই বলতে চাস কি? গরীব ঘরের মেয়ে তো কি হয়েছে? তুই কি দিন দিন স্নব হচ্ছিস নাকি?

—আমি সেকথা বলছি না। আমিও তো গরীবের ছেলে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সান্ত্বনা একজন অ্যামেচার অ্যাকট্রেস। অফিস-টফিসের ক্লাব-থিয়েটারে অভিনয় করে।

হেমন্ত চোখ সরু করে আমার দিকে তাকালো। হেমন্তর চোখে মুখে অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। হেমন্তর মনে সুখ নেই। অনেক সুদিন-দুর্দিনের বন্ধু আমরা। কোনো কিছু লুকোবার চেষ্টা করলেও আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি।

হেমন্তর চোখে মুখে চঞ্চলতা। পরপর সিগারেট ধরিয়েই যাচ্ছে। সব সময় কিছু যেন লুকোতে চাইছে। আমার কাছ থেকে, না নিজের কাছ থেকে? নিজের কাছেই কোনো কিছু লুকোবার সময় মানুষ এত বেশি নার্ভাস হয়ে যায়।

আমি জানি, মনীষার বাবা হেমন্তকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এক মেয়ে বিয়ে করেনি, এই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একথা সকলেই জানে, সাধারণভাবে পাত্রী হিসেবে দেখিয়ে মনীষার বিয়ে দেওয়া যাবে না। মনীষাকে সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হতে বলবে—এমন সাহস কারুর নেই, মনীষার বাবারও না! অথচ মনীষা নিজে থেকেও কারুকে বিয়ে করতে চাইবে না। ও নিজে কোন্ নেশায় মেতে আছে, কে জানে?

হেমন্ত বললো, থিয়েটার করে? তুই কোনো থিয়েটারে ওকে দেখেছিস?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না, দেখিনি। কিন্তু ঐ টাইপটা আমি চিনি। আমি তো নানান অফিসে কাজ করেছি; কেরানিও ছিলাম, তোর মতন অফিসার নয়, অফিস-ক্লাবের অনেক থিয়েটার দেখেছি। অফিসের তিরিশ চল্লিশ জন পুরুষ থাকে, আর বাইরের দু' তিনটি মেয়েকে ভাড়া করে আনা হয়। মধ্যবিত্ত ছা-পোষা বাঙালীদের তো তুই চিনিস, বাড়িতে এরা নীতিবাতিকগ্রস্ত, কিন্তু এইসব থিয়েটার-ফিয়েটারের সময়ে পুরুষত্ব উসখুস করে। দুঃখী সংসার থেকে আসে এইসব মেয়েরা, কারুর বাবা বেকার, কেউ পিতৃহীন, কারুর দাদা মারা গেছে পুলিশের গুলিতে কিংবা দাঙ্গায়। সত্তর-পঁচাত্তর টাকা পায় এক-একটা অভিনয়ে। তার

আগে ছ-সাতদিন রিহার্সালের পর এদের বাড়ি পে'ীছে দেবার জন্য রেশারেশি করে—। বাড়ি পে'ীছুবার মাঝপথে কখনো ঢুকে যেতে হয় কোনো রেস্তোরাঁর পর্দা ঢাকা ক্যাবিনে। কিছু টাকা বেশি উপার্জন হয়! সকলে এ'রকম নয়। অনেকেই। এদের মধ্যে কারুর কারুর চেহারা বেশ ভালো, বিয়ে হলেও হতে পারতো, কিন্তু বিয়ে হলে পরিবারের অন্যান্য লোকেরা না-খেয়ে থাকবে! আমি চিনি এই টাইপটা। দেখলে বুঝতে পারি! তোর সঙ্গে সান্ত্বনার কোথায় আলাপ হলো?

হেমন্ত তখনও লুকোবার চেষ্টা করে বললো, বললাম তো, আমার মামাবাড়িতে ওর সঙ্গে অনেকদিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

—ফের মিথ্যে কথা বলছিস্!

হেমন্ত বললো, সান্ত্বনা থিয়েটার করে কিনা আমি জানি না। কিন্তু তুই কি এখনো মনে করিস নাকি, মেয়েদের থিয়েটার করাটা অন্যায়?

হেমন্ত, কেন এসব করছিস পাগলের মতন? সত্যি করে বল্ তো সান্ত্বনার সঙ্গে তোর কোথায় অলোপ হয়েছে? তোর মামাবাড়িতে যে আলাপ হয়নি সেকথা আমি বাজি ফেলে বলতে পারি!

—মামবাড়িতেই তো আলাপ হয়েছে।

—মোটেই না!

—যা, যা, আর কথা বাড়াতে হবে না। চল তো এখন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে!

—সান্ত্বনার সঙ্গে তোর কি করে আলাপ হলো আমাকে যদি না বলিস, আমি তোর সঙ্গে যাবো না।

—আচ্ছা মুস্কিল তো! তোর এত কিউরিসিটি কেন? সান্ত্বনাকে তোর ভালো না লাগতে পারে, আমার খুব ভালো লেগেছে! কি মিষ্টি মুখখানা—ব্যবহার কত সোবার—

—কোথায় আলাপ হয়েছে?

—জ্বালিয়ে মারলি তুই! আমাদের অফিসের এক কলিগ আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমার সিনেমা লাইনের অনেকের সঙ্গে

জানাশ্নো আছে, আমার কাকা একটা ছবি প্রোডিউস করেছিলেন তো, তাই ভদ্দরলোক ধরেছেন যদি আমি সান্ত্বনাকে সিনেমায় একটা চান্স করিয়ে দিতে পারি। আমি সান্ত্বনার জন্য সীরিয়াসলি চেষ্টা করবো, ওকে আমার পছন্দ হয়েছে খুব, ওর জন্য একটা কিছু করা দরকার—

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, জানি! ঐ স্তোকবাক্যটুকুতেই সান্ত্বনা তোর জন্য সব কিছু করতে রাজি আছে! এইসব মেয়েদের স্বপ্ন শুধু একটা। কোনো একদিন এক দেবদূত এসে ওকে সিনেমার নায়িকা করে দেবে। তার-পরই বাড়ি, গাড়ি, বোম্বে—

—চল, চল, এখন চল তো! রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি?

—হেমন্ত, এসব করে কি হবে? নিজেকে ঠকাচ্ছিস?

হেমন্ত হঠাৎ চটে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়ালো রাস্তার রেলিং ছেড়ে। আন্তরিক রাগের সঙ্গে বললো, তুই যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা বলার চেষ্টা করিস সুনীল, তোকে আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি! আমি মনীষাকে বিয়ে করবো না। দ্যাট ইজ ফাইন্যাল! কেন বিয়ে করবো না জানিস? তুই জিতে যাবি বলে! বিয়ে করলে আমি হতাম মনীষার স্বামী, আর তুই চিরকাল থাকবি ওর প্রেমিক। কে না জানে স্বামীরা একদিন না একদিন এলেবেলে হেঁজিপেঁজি হয়ে যায়, আর প্রেমিকরা চিরকালই প্রেমিক থাকে। তোকে মোটেই আমি সে চান্স দিচ্ছি না, যতই আমাকে ভজাবার চেষ্টা করো। আমিও মনীষার প্রেমিক থাকতে চাই।

এরপর বৌবাজারের মোড়ে সেইদিন সন্ধ্যেবেলার কথা।

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধ্যেবেলা। ...ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে আমাদের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে। তারিখটা মনে আছে, ১৭ই জুলাই...।

সুবিমলের গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম আমি আর হেমন্ত। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্যাক্সি। বৌবাজারের মোড়ে··· মনীষা ওখানে একা দাঁড়িয়েছিল কেন? আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমিও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম কেন? আজও তার ব্যাখ্যা আমি জানি না। মনীষা পথের ওপর একলা দাঁড়িয়ে, তাকে দেখেও আমি চলে যাবো, এ'রকম অসম্ভব ব্যাপার আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না। হেমন্ত সঙ্গে ছিল বলেই কি? হেমন্ত আর আমি একসঙ্গেই তো জীবনে অনেক পুণ্য ও পাপ করেছি।

পরে হেমন্ত আর আমি দুজনে একসঙ্গে খুঁজেছিলাম মনীষাকে। ট্যাক্সি নিয়ে তাড়া করেছিলাম বাস। পাইনি। মনীষা উধাও হয়ে গিয়েছিল।

মনীষা নাম্নী একটি মেয়েকে আমি ও হেমন্ত—আমরা দুই বন্ধু মিলে ভালোবাসতাম। আমরা কেউই ওকে বিয়ে করিনি। এর মধ্যে কোন গল্প নেই। এ'রকম প্রায়ই ঘটে। গল্প শুধু এই, পথের মধ্যে মনীষার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তারপর আমরা দুজনেই কেউ আর মনীষার দেখা পাইনি, অনেক চেষ্টা করেও। কার যেন কবিতা আছে, সম্ভবত ব্রাউনিং-এর, আউট অফ অল ইয়োর লাইফ, গিভ মী বাট আ সিঙ্গল মোমেন্ট। এ সেই একটি মুহূর্ত হারানোর গল্প।

মনীষাকে জাগ্রত স্বপ্নে দেখেছি বহুবার। কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে কিংবা অন্য কোথাও আর মনীষার সঙ্গে দেখা হয়নি। হেমন্তও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

হেমন্ত আর আমি পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করতে চেয়েছি, হেমন্ত মনীষার বাবাকে কিছু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু মনীষাকে তো আমরা কিছুই বলিনি কখনো। ভালোবাসা বা প্রত্যাখ্যান— কিছুই না! সেই সন্ধ্যেবেলার পর থেকে মনীষার দেখা না পাওয়াটা খানিকটা অলৌকিক মনে হয়। সকালবেলা ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনেছি, মনীষা আগের রাত্তির থেকে ওর মাসির বাড়িতে আছে, রাত্তিরবেলা গিয়ে শুনেছি, ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেছে।

কয়েকদিন পর শুনলাম, মনীষা বেড়াতে চলে গেছে দিল্লীতে।

শুনেই মনে হলো, আমারও দিল্লী না যাবার কোনো মানে হয় না। কত সুন্দর শহর দিল্লী, কত দিন দেখা হয়নি। অফিসে এখন কাজের খুব চাপাচাপি, যদি ছুটি পেতে অসুবিধে দেখা দেয়—তাহলে এক লাথি মেরে চাকরি ছেড়ে গেলেই তো হয়। ঘড়ি কলম বিক্রী করে টাকা জোটানো যাবে, কিংবা সুবিমল ধার দেবে। দিল্লীতে গিয়ে কোথায় থাকবো ? আর কোথাও যদি থাকবার জায়গা না পাই, রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে বলবো, এত জায়গা খালি পড়ে আছে, আমাকে থাকতে দাও !

হেমন্ত বললো, তুই দিল্লী যাচ্ছিস তো ? আমার দিদি আর জামাইবাবু থাকে করোলবাগে। তুই ওখানে উঠিস, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি !

হেমন্ত আমার মনের কথাটাই বুঝে ফেলেছে বলে আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, ভ্যাট, আমি দিল্লী যাচ্ছি কে বললো ? হঠাৎ দিল্লী যাবো কেন ?

—যা না, ঘুরে আয়। এই রকম সময়ে দিল্লীতে খুব ভালো সীজন।

—আমার অফিস-টফিস নেই ? দিল্লীতে যাবো কি করে ?

—তোর তো ভারি অফিস ! অফিস গুলিমার। যা, ঘুরে আয়।

—না রে, এখন দিল্লী-টিল্লি যাওয়া হবে না। কলকাতায় অনেক কাজ !

—কি কি কাজ বল্। আমি করে দিচ্ছি। তুই তো দিল্লীতে সেই একবার মোটে গিয়েছিলি ! এখন দেখবি, অনেক বদলে গেছে। বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। আমার দিদিকে তা হলে চিঠি লিখে দিই !

না, না ! যদি যাইও, তোর দিদির বাড়িতে থাকতে পারবো না। তোর জামাইবাবুকে চিনি না—অচেনা জায়গায় থাকতে আমার খুব অস্বস্তি লাগে—

—তোর কিছু অসুবিধে হবে না। জামাইবাবু বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন না। ওদের একস্ট্রা ঘর আছে—বিছানা-টিছানা সব আছে। আমারই তো যাবার কথা ছিল সামনের সপ্তাহে

—কাজেই সব ব্যবস্থা করা আছে।

—তোর যাবার কথা ছিল? তা হলে চল্, একসঙ্গে যাই—হেমন্ত মুচকি হেসে বললো, না আমি যাবো না।

আমি অনুনয় করে বললাম, কেন, যাবি না কেন? চল না, অনেকদিন তুই আর আমি একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাইনি।

—না, আমার যাওয়া হবে না। অফিস থেকে আমার ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়েছিল দিল্লীতে। আমি ক্যানসেল করে দিয়েছি এখন। তার বদলে বাঙ্গালোর যাবো।

আমি ভর্ৎসনার সুরে বললাম, কেন ক্যানসেল করলি?

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললো, কেন করলাম, বুঝতে পারলি না। আমি হ্যাণ্ডিক্যাপ নিতে চাই না। তোর অফিস থেকে ছুটি পেতে ঝামেলা হবে, দিল্লীতে তোর থাকার জায়গা নেই, তোর হাতে টাকাকড়ি এখন কম—এতগুলো অসুবিধে তোর। আর আমি অফিসের ভাড়ায় দিল্লী যাবো, দিদির বাড়িতে থাকবো, তার ওপর মনীষার সঙ্গে দেখা হবে, এতগুলো সুযোগ নেওয়া কি উচিত আমার?

—তাহলে চল্, দুজনেই একসঙ্গে যাই?

—মনীষার সঙ্গে আর কখনো আমাদের দুজনের একসঙ্গে দেখা হবে না।

—কেন?

—এটাই আমাদের নিয়তি। আমরা মনীষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। তুই একা চেষ্টা করে দ্যাখ্—

হেমন্ত সত্যিই বাঙ্গালোরে যায় কিনা সেটা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম কয়েকদিন। তারপর সত্যিই একদিন আমি হেমন্তকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিলাম।

…কনট্ সার্কাসে একটা বইয়ের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে, একটা উলের দোকান থেকে বেরুলো মনীষা। উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি, কনুই পর্যন্ত ঢাকা হাতার লাল ব্লাউজ, লাল চটি, লাল ব্যাগ—ওর শরীর থেকে যেন লাল গোলাপ ফুলের

আভা বেরুচ্ছে। কনট্ সার্কাসের এত মানুষজন, এত ভিড়—সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেল। মনে হলো, আর কোথাও কিছু নেই—জগৎ সংসার জুড়ে শুধু ঐ লালরঙা শাড়ী পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

হাত ব্যাগ খুলে পয়সা বার করলো মনীষা। নিচু হয়ে পরম করুণায় পয়সা দিল ভিখিরিকে। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, মনীষা যখন ভিখিরিকে কিছু দেয় তখন শুধু পয়সাই দেয় না, ওর আত্মার একটা টুকরোও তুলে দেয়।

এরপর মনীষা ফলের দোকান থেকে কমলালেবু কিনলো। সেখানেও একটা বাচ্চা ছেলে এসেছে, হাত পেতেছে। মনীষা তার হাতে তুলে দিল একটা কমলালেবু। মনীষা একা। মনীষা কোন দিকে যায়, দেখি।

ঝপ করে ট্যাক্সি ডেকে মনীষা তাতে উঠে পড়লো। আমি দৌড়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। লোকজনের ভিড়, অন্যান্য গাড়ি —আমি পৌঁছুবার আগেই মনীষার ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে।

যাক না, দুঃখ নেই, আবার দেখা হবে। দিল্লী শহরটা এমন কিছু একটা জটিল জায়গা নয়। মনীষার পিসিমার বাড়ি শংকর রোডে।

...কটেজ ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরুচ্ছে মনীষা। হাতে অনেকগুলো প্যাকেট! সঙ্গে ওর বাবা। এক্ষুনি ট্যাক্সি ধরবে না, হাঁটছে। ঠিক তিরিশ গজ দূরে থেকে আমি ওদের অনুসরণ করছি। মনীষার বাবা দেখলেও আমার কিছু যায় আসে না। দিল্লী ইউনিভারসিটির এক সিমপোসিয়ামে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে। নেমন্তন্ন করতেই পারে।

ট্যাক্সি নয়, বাসে উঠলো মনীষা। মনীষার বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি এখন ফিরবেন না। প্রায় ওঁকে ঠেলেই আমি দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়লাম। মনীষার পাশে আমার জন্য তো খালি জায়গা থাকবেই!

মনীষা ভুরু তুলে হাস্যময় মুখে বললো, এই, তুমি কবে এলে?

—মনীষা, আজই এসেছি আমি। ট্রেন থেকে নেমেই তোমাকে খুঁজছি।

—ভ্যাট। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

কিছু আনিনি। শুধু একটা সুটকেস—সেটা স্টেশনের লেফট

লাগেজে—

—সত্যি সত্যি তুমি আজই এসেছো !

—হ্যাঁ, সত্যিই। বলতে গেলে এই মাত্র।

—বাইরে কোথাও এসে চেনা কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব ভালো লাগে, তাই না ?

—আমি শুধু একজনের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।

—তুমি কোথায় থাকবে ? আমার পিসীমার বাড়িতে থাকবে ? জায়গা আছে। পিসীমা খুব ভালো লোক—

—না, না, আমি হোটেলে উঠবো। তোমাকে না পেলে আজই ফিরে যেতাম।

—কেন, হঠাৎ দিল্লীতে এসেছো কেন ? কোনো কাজ আছে বুঝি ?

—শুধু তোমাকে দেখতে। এই ক'দিনেই আরও কি সুন্দর হয়েছো তুমি—

সঙ্গে সঙ্গে মনীষার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, অনুভাদির খবর শুনেছো ?

—না তো। কি হয়েছে ?

—অনুভাদি মারা গেছেন। কাল বৌদির চিঠি পেলাম—আমার এত মন খারাপ লাগছে !

আমি মনীষার একটা হাত তুলে নিয়ে সামান্য চাপ দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে কারুর মৃত্যু সংবাদ না শুনলেই ভালো হতো। আমি মনীষার রূপের প্রশংসা করেছি তো, তাই ও মৃত্যুর প্রসঙ্গটা তুললো হঠাৎ। পৃথিবীতে এ'রকম মেয়ে আর আছে ?

—মনীষা, এখন বাড়ি ফিরে কি করবে ?

—কেন বলো তো !

—এখন তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না। তুমি এখন আমার সঙ্গে থাকবে।

—হাতে এত জিনিসপত্তর রয়েছে যে ?

—প্যাকেটগুলো বাড়িতে রেখে এসো। এগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় না। তারপর আমরা খুব বেড়াবো। এসো, বাস ছেড়ে

দিয়ে ট্যাক্সি নিই—

—এই তো এসে গেছে আমাদের বাড়ি।

মনীষা জোর করে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। মনীষার তো মনে কোনো গ্লানি নেই। ওর পিসীমাকে ডেকে বললো, পিসিমণি এই হচ্ছে সুনীলদা! চেনো না! তুমি তো কিছু বাংলা বইটই পড়ো না! অবশ্য সুনীলদার লেখা পড়লেও তোমার ভালো লাগতো না। সুনীলদা খুব, খারাপ খারাপ লেখে। কেন যে ছাপা হয় ওসব। পিসিমণি, আমি সুনীলদার সঙ্গে বেরুচ্ছি!

—মনীষা, আমি লালকেল্লায় সন-এ-লুমিয়ের দেখিনি।

—আমি দেখেছি।

—তুমি আমার সঙ্গে আবার দেখবে না?

—আমি কখনো কুতুবমিনারের ওপরে উঠিনি।

—আমি উঠেছি একবার। আবার তোমার সঙ্গে উঠবো।

—আমরা কাল ওখলা গিয়েছিলাম।

—আজ তুমি আর আমি আবার যাবো।

—আচ্ছা, তুমি কখনো মহাত্মা গান্ধীর সমাধির সামনে দাঁড়িয়েছো? মনটা কিরকম অন্যরকম হয়ে যায় না?

—আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। এসো আজ গান্ধীর সমাধিতে গিয়ে ফুল দিই। যদিও আমি একটুও গান্ধীভক্ত নই।

—হুমায়ুনস্ টুম-এ গেলে মনে হয় না, সারাদিন ওখানেই বসে থাকি?

—আজ সারাদিন ওখানেই বসে থাকবো।

—সুনীলদা, তুমি দিল্লীতে আর ক'দিন থাকবে?

—যে ক'দিন তুমি আছো। মনীষা, আমরা শুধু বেড়াচ্ছিই, কোনো কথা বলা হচ্ছে না। অনেক কথা আছে—

—বাঃ, আমরা কি এই ক'দিন বোবা হয়েছিলাম?

—এই ক'দিন মানে? তোমার সঙ্গে আমার এই তো কয়েক মিনিট আগে দেখা হলো!

—এই তিনদিন ধরে যে এত জায়গায় বেড়ালাম? লালকেল্লা, ওখলা, গান্ধীঘাট। কিন্তু এই হুমায়ুনের সমাধিটাই আমার সবচেয়ে সুন্দর লাগে!

—মনীষা, তোমার সঙ্গে একটাও কথা বলা হয়নি।

—তা হলে এতক্ষণ ধরে কে বক্‌বক্‌ করলো? সব বুঝি আমিই বলছি?

—আরও অনেক কথা আছে। মনীষা, তোমার হাতটা দাও তো। কি সুন্দর গন্ধ তোমার হাতে! মনীষা, এসো, এখানে একটু দৌড়াই। দৌড়োবে?

—হ্যাঁ। এক্ষুনি। রেস দেবে? তুমি পারবে আমার সঙ্গে। দেখি তো—

—না, রেস নয়। হাতে হাত ধরে। হাতে হাত ধরে ছোটার মধ্যে ভীষণ একটা খুশির ব্যাপার আছে। আমার এত ভালো লাগছে—

—এসো, আমার হুমায়ুনের সমাধির চারপাশটা দৌড়ে আসি!

—মনীষা, হুমায়ুনের মতন তোমার যদি কখনো অসুখ করে, আমি আমার জীবনীশক্তি দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবো।

—এই যাঃ! বৃষ্টি এসে গেল! আমরা কিন্তু ভিজবো—

—মনীষা, এখানে কেউ নেই। তোমার কানে কানে একটা কথা বলবো?

—কানে ফু দিয়ো না কিন্তু বলছি—

—মনীষা, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে···

—সুনীলদা, তোমার পকেট থেকে সব পয়সা পড়ে গেল!

—পড়ুক! মনীষা, আমাকে ক্ষমা চাইতে দাও! সেদিন বৌবাজারের মোড়ে তোমাকে দেখেও···

—তুমি আগ্রা দেখেছো? আমি ফতেপুর সিক্রি যাইনি।

—তোমাকে দেখেও আমি···

—এখানে ফুল ছিঁড়লে কেউ বোধহয় কিচ্ছু বলবে না। ঐ রঙ্গন ফুলের একটা থোকা এনে দাও না আমাকে—

আঃ, তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি, তুমি শুনছো না কেন?

—শুনেছি তো !

—আচ্ছা, থাক ওসব কথা। চলো, আমরা এক্ষুণি তাজ এক্সপ্রেসে চেপে আগ্রা চলে যাই, ওখান থেকে ফতেপুর সিক্রি। তুমি যা যা দেখনি, তোমাকে সব দেখাতে চাই। আমার কাছে অনেক টাকা—

—আমি তো কত জায়গা দেখিনি !

—তোমাকে সব জায়গায় নিয়ে যাবো। সারা জীবন এই রকম বেড়িয়ে বেড়ালে কী রকম হয় ?

—আমি রাজি। সারা জীবন ? পারবে ?

—কেন পারবো না ? যদি টাকা ফুরিয়ে যায়—একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করলেই তো হয়। খুব শক্ত নয়—তোমার পিসেমশাই তো জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার। ওঁর সারভিস রিভলভারটা কয়েক ঘণ্টার জন্য লুকিয়ে আনতে পারবে না ?

—তারপর কি হবে ?

—আমি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরবো কোনো ব্যাঙ্কের কাউন্টারে। তুমি মুখে একটা কালো মুখোশ পরে একটা থলিতে সব টাকাগুলো ভরে নেবে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাড়া করা কালো অ্যামবাসেডর !

—আমিও তো অ্যাকমপ্লিস হয়ে যাবো। তারপর ধরা পড়লে ?

—ধরা পড়লো তুমি আর আমি জেলখানার এক ঘরে থাকবো। সেটাও তো এক রকমের বেড়ানো।

—জেলে বুঝি এক ঘরে থাকতে দেয়।

—দেয় না বুঝি ? তা হলে তো মুশ্কিল। একমাত্র বিয়ে নামক জেলখানাতেই একসঙ্গে থাকা যায়। তবে কি আগেই সেই জেলখানা—

মনীষা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, ভ্যাট ! তোমাকে কে বিয়ে করবে ? তুমি একটা পাগল !

—আমি পাগল ? তাহলে পৃথিবীতে একটাও সুস্থ মানুষ নেই। তা ছাড়া আমিও তো তোমাকে মোটেই বিয়ে করতে চাই না !

—ভাগ্যিস! না হলে মহা মুস্কিল হতো।

—কিসের মুস্কিল?

—তোমাকে বিয়ে করা কিংবা বিয়ে না করা।

—তার মানে?

—কিছু মানে নেই।

—মনীষা, তুমি ভীষণ আজকাল রহস্য করে কথা বলো।

—তা হলে এসব কথা না তুললেই হয়।

—আমাকে একটু আদর করতে দেবে? আমি তোমাকে একটু আদর করবো।

—এই রঙ্গন ফুলের থোকাটা আমার খোঁপায় গুঁজে দাও!

—তাকাও আমার দিকে। দেখি তোমাকে ভালো করে। তোমার চোখ দুটো কত সুন্দর আমি জানি না। কিন্তু কি অসম্ভব সুন্দর তোমার এই রকম চেয়ে থাকা। এই রকম হাসি মাখানো চোখের দৃষ্টি আমি আর কখনো দেখিনি।

—আকাশের দিকে তাকাও! শিগগিরই দারুণ ঝড় উঠবে।

—মনীষা, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে আমি ভুল করেছিলাম বলেই কি—

—আমি কান চেপে দিয়ে আছি। খুব জোরে কান চেপে থাকো, কী রকম বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়—

আবু হোসেনের স্বপ্ন। আমি দিল্লীতে সত্যিই গিয়েছিলাম বটে, মনীষার সঙ্গে দেখা হয়নি। উঠেছিলাম কালীবাড়িতে। মনীষার পিসীমার খোঁজ করেছিলাম। মনীষারা তখন হরিদ্বার চলে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। আমিও গিয়েছিলাম হরিদ্বার। তবু দেখা হলো না। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা পর্যন্তও গেছি—মনীষা নেই। এমনও হতে পারে, আমি যেদিন হরিদ্বারে ওরা সেদিন লছমন-ঝোলায়। আমি যখন লছমনঝোলার পথে, ওরা তখন ফেরার ট্যাক্সিতে আমার পাশ দিয়েই চলে গেছে—আমি দেখতে পাইনি। মনীষা তো জানতো না, আমি ওকে অনুসরণ করেছি। সুতরাং ওর পালিয়ে বেড়াবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হেমন্ত বলেছিল,

এটাই আমাদের নিয়তি।

দিল্লী ফিরে শুনলাম, ওরা আবার অমৃতসর হয়ে সিমলার দিকে গেছে। বাধ্য হয়ে আমাকে কলকাতায় ফিরতে হলো। মনীষার খোঁজে তো আমি সমস্ত উত্তর ভারত চষে বেড়াতে পারি না।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, কি রে, দেখা পেলি ?

মিথ্যে কথা বলতে পারতাম। কিংবা স্বপ্নের কথা। কিন্তু হেমন্তর কাছে এখন তা আর বলা যায় না। হেমন্ত আমার থেকে ওপরে উঠে গেছে। ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

হেমন্ত মন দিয়ে আমার কথা শুনলো। তারপর বললো, কতদিন আর ঘুরে বেড়াবে। কলকাতায় তো ফিরতেই হবে। তবে অরুণের কাছে শুনলাম, ওর বাবা লিখেছেন সিমলায় নাকি একটি চমৎকার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। যাক গে, শোন, একটা দরকারি কথা আছে—

ঝট্ করে ড্রয়ার খুলে হেমন্ত একটা ব্র্যান্ডির বোতল বার করলো। চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলো, খাবি ?

আমি বললাম, কি ব্যাপার রে ? তুই, আজকাল অফিসে এইসব রাখতে শুরু করেছিস ?

—আরে ধুৎ ! চোর কোম্পানির অফিস, কে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় ? দুপুরের দিকে একটু না খেলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে।

—হেমন্ত, তুই আজকাল বড্ড বেশি খাচ্ছিস !

হেমন্ত হা-হা করে হেসে বললো, দেবদাস হয়ে যাবো ? দেবদাস ! মাইরি ক'দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, এর মধ্যে সান্ত্বনাও কেটে পড়েছে !

চশমাটা খুলে হেমন্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। পুরু চশমা যারা পরে, চশমা খুললে তাদের মুখটা হঠাৎ কী রকম অসহায় দেখায়।

খানিকটা আপনমনেই বললো, চৌত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল। আবার যদি কেউ আঠারো বছর বয়েসটা ফিরিয়ে দিত, সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবনটা শুরু করতাম। মানুষের জীবনের একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকা দরকার। আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই।

—তুই যে কী দরকারি কথা বলবি বলছিলি ?

—ও হ্যাঁ। এবার বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম একটা বিশেষ মতলোব নিয়ে, সেটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। কোম্পানি আমাকে ছ'মাসের জন্য বিলেত পাঠাচ্ছে !

আমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি হেমন্তর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

—এ জন্য বড় বড় সাহেবদের খুব তেল দিতে হয়েছে। ব্যাটারা কিছুতেই রাজি হতে চায় না। নিজেরা সবাই বছরে একবার করে যায়, শুধু আমার বেলাতেই কিপ্টেমী !

—তুই বিলেত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে গেলি কেন ? একবার তো গেছিস আগে।

—আরে বিলেত কি পুরানো হয় ? যতবার যাওয়া যায়—ছ'মাসের জন্য আপাতত পাঠাচ্ছে, যদি আরও ছ'মাস বাড়াতে পারি—

আমি চুপ করে বসে রইলাম। হেমন্ত লুকিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলে চুমুক দিয়ে ঠোঁট মুছলো। তারপর কৌতুক করে বললো, কি রে, তোর হিংসে হচ্ছে আমি বিলেতে যাচ্ছি বলে ?

হঠাৎ দপ করে আমার মেজাজ চড়ে গেল। হিংস্রভাবে তাকিয়ে বললাম, শালা, তোর বিলেতে আমি পেচ্ছাপ করে দিই। কিন্তু তুই পালাচ্ছিস। তুই মনীষার কাছ থেকে পালাচ্ছিস !

—আস্তে আস্তে ! এটা অফিস। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। এত মেজাজ খারাপ করছিস কেন ?

আমি উঠে বললাম, তোকে আমি যেতে দেবো না। এটা আনফেয়ার।

হেমন্ত টং টং করে বেল বাজালো। বেয়ারা এসে উঁকি মারতেই বললো, এই সাহেবের জন্য কফি নিয়ে এসো। আর সিগারেট দিয়ে যাও এক প্যাকেট।

আমি আবার ধপ করে বসে পড়লাম।

হেমন্ত ব্যস্ত ভঙ্গি করে বললো, ও'রকম মাথা গরম করিস নি। অনেক কাজের কথা আছে। যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে আমার। তোর

একটা ওভারকোট আছে না ? সেটা দিবি আমাকে। একটা ভালো চামড়ার সুটকেস কিনতে হবে—

আমি এবার অনুনয় করে বললাম, হেমন্ত, তুই সত্যিই কেন চলে যাচ্ছিস বল্ তো ? যদি যেতেই হয়, মনীষাকে বিয়ে করে ওকে সঙ্গে নিয়ে যা। মনীষা বেড়াতে খুব ভালোবাসে।

হেমন্ত বললো, সুনীল, তোর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। তোর তো বিলেত যাবার সুযোগ নেই। তুই মনীষাকে বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবি না !

—আমি পারলেও মনীষাকে নিয়ে যেতাম না। আমি তো ওকে বিয়ে করছি না। তুই পারিস্।

—তা আর হয় না। মনীষাকে আমি দিয়ে দিয়েছি তোর হাতে। তুই-ও ওকে পাবি না জানি। কিন্তু তুই কষ্ট তো পাবি। সেই কষ্টটুকু তোর নিজস্ব থাকুক।

ধর্মতলার মোড়ে অরুণের সঙ্গে দেখা। আমি দেখতে পাইনি, অরুণ পেছন থেকে আমার পিঠে একটা ঘুঁষি মেরেছে। দম বন্ধ করে আমাকে সেই ব্যথা সামলাতে হলো। অরুণের জামা-প্যান্ট সব ভেজা। খেলার মাঠ থেকে ফিরছে। বললো, অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসিস না কেন ? চল, আজ চল !

আমি বললাম, তোরও তো আজকাল পাত্তা পাই না। যাস না তাসের আড্ডায় ? চল্, কোথাও বসে একটু চা খাই।

—জামা-প্যান্ট যে ভিজে ঢোল। বাড়ি যেতে হবে।

—ঠিক আছে, যা তা হলে, পরে দেখা হবে।

—তুই আসছিস না কেন আমাদের বাড়ি ? সুজয়া বলছিল—

আমি বাড়ি বদল করেছি। অরুণদের বাড়ি বেশ দূরে বলে আর যাওয়া হয় না। অবশ্য আগে সারা কলকাতা চষে বেড়াতাম—

এই শহরটাকে খুব ছোট্ট মনে হতো।

—যাবো, শিগগিরই যাবো একদিন।

—আজ চল না। মধুবন এসেছে, ওর সঙ্গে দেখা হবে।

মুখের রেখা আমার একটাও পাল্টায় না। সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করি, মনীষা এসেছে নাকি? কবে এলো?

—এই তো পরশু দিন, থাকবে এখন কিছুদিন। ওর বাচ্চা হবে।

—তাই নাকি? এক্সপেকটেড ডেট কবে?

—এই তো অগাস্টেই।

—কোন নার্সিংহোমে দিবি? দেখতে যাবো এখন!

—আজই চল না।

—না, আজ নয়। মনীষাকে বলিস, দেখা করবো!

—মধুবন এসেই জিজ্ঞেস করছিল তোর কথা। তুই নাকি কি একটা গল্প লিখেছিস, তাতে ওর নাম দিয়ে দিয়েছিস? দেখা হলে তোকে দেবে এক চোট। আমি অবশ্য আজকাল কিছুই পড়ার সময় পাই না।

—তোকে পড়তেও হবে না।

—কবে আসছিস?

—যাবো কাল-পরশু।

না, দেখা করবো না আসলে। মনীষাকে আমি দেখতে চাই না। মনীষা হারিয়ে গেছে। এখন কত কাজে ব্যস্ত থাকি, মনীষার কথা তো প্রায় মনেই পড়ে না। এখন ফর্সা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই রুমালটা ময়লা হয়ে যায়।

সময় অনেক বদলে গেছে। আমি আর এখন কথায় কথায় চাকরি ছাড়ি না। বন্ধুরা ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে। মনীষার কথা কখনো-সখনো মনে পড়ে। রাস্তায় কোনো আলাদা ধরনের রূপসী দেখলে মনে হয়, এই বুঝি মনীষা।

বাচ্চা হবার আগে মনীষার কি রকম চেহারা হয়েছে জানি না। আমার সেটা দেখার দরকারও নেই। আমার চোখে শুধু ভাসে ওর সেই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে থাকা। সেই

অমর চিরকালীন দৃশ্য।

মনীষার বিয়ের দিন ওকে বলেছিলাম, তুমি আমাকে সারাজীবন দুঃখ দেবে। মনীষা ওর সুবর্ণ কঙ্কণপরা হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, যাঃ, এ কথা বলতে নেই। আমি একটা সামান্য মেয়ে—

বিয়ের দিন বড্ড বেশি সেজেছিল মনীষা। কিংবা ওকে সাজিয়ে দিয়েছিল জোর করে। ব্যাপারটা আমার চোখে লেগেছিল এইজন্য, মনীষাকে আর কোনোদিন আমি বেশি সাজতে দেখিনি। লগ্ন শুরু হতে তখনও অনেক দেরি ছিল, সম্পূর্ণ সাজ গোজ করে একটা সিংহাসনের মতন চেয়ারে বসে ছিল মনীষা, চারপাশে অনেক মেয়ে। বিয়ে আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত আমি থাকবো না, তাই আগেই ওকে একটু উঁকি মেরে দেখে যেতে এসেছিলাম। মনীষা ডেকেছিল হাত-ছানি দিয়ে।

কাছে যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হেমন্তদা আসেন নি?

—হেমন্ত তো নেই এখানে! ও তো বিলেত চলে গেছে!

—ওর ঠিকানাটা দিও তো।

—দেবো।

—এতদিন তোমার দেখা পাইনি কেন?

বিয়ে আরম্ভ হবার একটু আগে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না, সেই একদিন সন্ধ্যেবেলা বৌবাজারের মোড়ে তুমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? তোমাকে দেখার পরও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম—সেজন্য কি তুমি রাগ করেছো!

বললাম, আমিও তোমার দেখা পাইনি। তুমি কত সব জায়গা ঘুরে এলে।

মনীষাকে বলিনি, আমি ওর খোঁজে দিল্লী গিয়েছিলাম। হরিদ্বার লছমনঝোলা পর্যন্ত ছোটাছুটি করেছি। ওসব আর বলা যায় না।

মনীষা বললে তুমি আজ সারারাত থাকবে কিন্তু—

—না ভাই আমি একটু আগেই চলে যাবো।

—তুমি যদি চলে যাও, তাহলে আমি ভীষণ রাগ করবো—

ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম। অত সাজ-পোশাক পরে মনীষা খুব

ঘামছিল। আমরা একটুক্ষণের জন্য এসে দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়।

তিনতলায় সেই ঘর, যেটা মনীষার নিজের শোওয়ার ঘর। এই ঘরেই আজ বাসর হবে। লক্ষ্য করে দেখলাম, সেই তিন-চাকার সাইকেলটা নেই, কেউ সেটা সরিয়ে নিয়েছে। আমি একদিন স্বপ্নের মধ্যে এই বারান্দা দিয়ে মধ্যরাত্রে মনীষার ঘরে ঢুকেছিলাম। আজ মধ্যরাত্রে এই ঘরে সত্যি সত্যি একজন অন্য পুরুষ মানুষ আসবে।

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, তুমি আমাকে সারা জীবন দুঃখ দেবে।

মনীষাকে আমি কোনোদিন প্রণয়ের কথা বলিনি। ওর বিয়ের রাত্রে শুধু বলেছিলাম ঐ দুঃখের কথা।

চন্দনের ফোঁটায় সাজানো মনীষার মুখখানা বিহ্বল হয়ে গেল। অস্ফুটভাবে বলল, যাঃ, ওকথা বলতে নেই! আমি একটা সামান্য মেয়ে—

আমি বললুম, তুমি তো বিয়ের পরই লক্ষ্নৌ চলে যাচ্ছো। এরপর আর বহুদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

—কেন দেখা হবে না? আমি তো প্রায়ই কলকাতায় আসবো। তাছাড়া তোমরা লক্ষ্নৌ যাবে না?

—না।

—কেন?

—তুমি এবার ভেতরে যাও। তোমাকে কারা যেন ডাকছেন!

আমি চলে আসতে চাইছিলাম। মনীষা তবু আমার হাত ধরে রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে?

—কার সঙ্গে? দীপঙ্করের সঙ্গে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। চমৎকার ছেলে। এত ভদ্র ও বুদ্ধিমান ছেলে খুব কম দেখেছি আমি!

সত্যি, মনীষার স্বামী অসাধারণ ভালো। প্রেমিকার স্বামীকে অপছন্দ করাই নিয়ম। কিন্তু দীপঙ্করকে কিছুতেই ভালো না লেগে যায় না। অত্যন্ত বিনীত অথচ ন্যাকা নয়। প্রখর রসিকতা-বোধ আছে। চরিত্রে কোনো মালিন্য নেই।

সিমলায় স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের কাছে মনীষার বাবার হঠাৎ স্ট্রোকের মতন হয়। বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে। কাছেই ছিল দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের সঙ্গে আগেই ওদের আলাপ হয়েছিল। দীপঙ্করের জন্যেই সেবার মনীষার বাবা বেঁচে যান। তিনদিন জ্ঞান ছিল না —সেই সময় দীপঙ্করই যাবতীয় বড় বড় ডাক্তার এনে হাজির করে —বরুণদা ও অরুণকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। টেলিগ্রাম পাবার পর ওরা গিয়ে পেঁছুতে যে সময় লেগেছিল—তার মধ্যে দীপঙ্কর না থাকলে যে কী হতো বলা যায় না। মনীষা একলা আর কতটাই বা করতে পারতো!

সেরে উঠে মনীষার বাবা দীপঙ্করের কাছে মানসিকভাবে প্রায় ক্রীতদাস হয়ে গেলেন। হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর সেই উপকারী, বিনয়ী, অবিবাহিত যোগ্য ছেলেটির সঙ্গে মনীষার বাবা যদি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, তাতেও কোনো দোষ দেওয়া যায় না। এতে কারুর আপত্তি করার কথাও নয়। দীপঙ্কররা দু'তিন পুরুষ ধরে লক্ষ্নৌয়ের প্রবাসী। অবস্থাপন্ন, দীপঙ্কর নিজেও বেশ সুশ্রী এবং ভালো চাকরি করে। অত্যন্ত শুভ যোগাযোগ।

আমিও এই ব্যাপারটাতে আশ্চর্য হইনি। কারণ আমি জানতাম, বৌবাজারের মোড়ে সেই এক মুহূর্তের ভুলে আমি মনীষাকে চিরকালের মতন হারিয়েছি। কেন সেইরকম ভুল করেছিলাম জানি না।

বিয়ের পর লক্ষ্নৌ চলে গিয়েছিল মনীষা। দু'মাস বাদেই একবার ফিরেছিল। সেবার আমি দেখা করিনি। মনীষার সুখী বিবাহিত জীবনে আমার পক্ষে মাথা গলানো এখন একটা কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার। এসব আমি করতে পারি না। মনীষার সঙ্গে দেখা হলেই হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়বো। দেখা না করাই ভালো।

—এই সুনীল, তুই মধুবনকে দেখতে গেলি না?

—কোন নার্সিংহোমে আছে যেন? ক' নম্বর ক্যাবিনে?

—নার্সিংহোম থেকে তো বাড়ি চলে এসেছে। ওর একটা ছেলে হয়েছে।

—এর মধ্যে বাড়ি চলে গেল? ছেলে? বাঃ খুব সুখবর! ক' পাউন্ড ওজন?

—সাত পাউন্ড।

—বেশ নর্মাল তার মানে। দুজনেই ভালো আছে তো। মিষ্টি-ফিষ্টি খাওয়ানো হবে?

—তুই আয় একদিন আমাদের বাড়িতে। আজই চল—মধুবন বলছিল তোর কথা।

—আজ নয়। কাল ঠিক যাবো। ও তো আরও থাকবে কিছুদিন?

—এখনও মাস দেড়েক আছে।

—মধুবনকে বলিস আমি হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম বলে নার্সিংহোমে যেতে পারিনি। ওর ফিরে যাবার আগে একবার দেখা করে আসবো।

—আমরা ভাবছি একবার লক্ষ্ণৌ ঘুরে আসবো। তুই যাবি? চল্ না।

—গেলে মন্দ হয় না।

যাইনি। সেবারও যাইনি একদিনও। ভদ্রতা রক্ষা করে অন্তত নার্সিং হোম-এ যাওয়া উচিত ছিল একবার। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে মনীষার অন্যরকম চেহারা। মাতৃমূর্তিতে মনীষাকে দেখার ইচ্ছে একটু একটু হয়েছিল। যাকে ভালোবাসি, তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখলেও ভালো লাগে। হেমন্ত থাকলে যেতাম। দু'জনে এক সঙ্গে। একা যাওয়া যায় না।

—এই সুনীল, মনীষা চিঠি লিখেছে। তোকে বলেছে ওর ছেলের জন্য নাম ঠিক করে দিতে।

—নাম আমি কি করে ঠিক করবো?

—বাঃ, তোরা লেখকরাই তো নাম-টাম দিস।

—তা হলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস কর।

বাঃ, তোকে নাম দিতে বলেছে, অথচ তুই বলছিস অন্যদের কথা।

—আমার দ্বারা হয় না ওসব। কত বড় হয়েছে মনীষার ছেলে? কথা বলতে পারে?

অরুণ বললো, বছর দেড়েক হয়ে গেল। খুব কথা বলে। যা

দুষ্টু হয়েছে না। আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে সাতদিন ছিলাম—সব সময়টা তো ওকে নিয়েই কেটে গেল। তারপর ওখান থেকে সবাই মিলে রাজস্থান ঘুরে এলাম। তুই গেলি না কেন আমাদের সঙ্গে ?

—আমি যে তখন দারুণ ব্যস্ত ছিলাম।

—তুই আজকাল খুব ব্যস্ত মানুষ হয়েছিস, তাই না ?

হেমন্ত চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে, মনীষা কি লন্ডনে গেছে ? কয়েকদিন আগে পিকাডেলি সার্কাসে চলন্ত ট্যাক্সিতে ও অবিকল মনীষার মতন একটি বাঙালী মেয়েকে দেখেছে। মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। হেমন্ত আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করেও ধরতে পারেনি।

মনীষা লন্ডনে যায়নি। হেমন্তও লন্ডনে বসে মনীষার স্বপ্ন দেখেনি।

—এই সুজয়া, কোথায় যাচ্ছো ?

সুজয়া মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর বললো, তবু ভাগ্যিস চিনতে পারলেন! কতদিন দেখা নেই। আর তো আসেনই না—

—বড্ড দূর হয়ে গেছে।

বাজে কথা। আপনি আমাদের ওদিকে কখনো আসেন না ? অবশ্য আমাদের বাড়িতে আর আসবেনই বা কেন ? আকর্ষণ তো নেই কিছু ?

—তুমিই তো মস্ত বড় আকর্ষণ।

—থাক খুব হয়েছে। আমি সব জানি, আপনি একটা কী রকম যেন! মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। যাক শুনুন, এবার একদিন আসবেন ? মধুবন এসেছে।

—মনীষা আবার এসেছে ?

—কেন, ও এলে আপনার অখুশি হবার কারণ আছে নাকি ? বাপের বাড়ি আসবে না ?

—না, তা বলছি না। এই তো সেদিন গেল।

—সেদিন কোথায় ? ন'মাস আগে। সেবার তো বেচারা বাড়িতেই বন্দী হয়েছিল। কোথাও যেতে পারেনি। এবার একটু

বেড়াবে! আপনি কি আপনার বাড়িতে একবার নেমন্তন্ন করতে পারেন না?

—কাকে?

—আমাকে না হয় নাই করলেন। মধুবনকেও তো একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পারতেন। ঠিক আছে, নেমন্তন্ন না করলেও আমরা এমনিই একদিন গিয়ে উপস্থিত হবো!

—আমাকে তো বাড়িতে পাবে না। আমি বাড়িতে থাকিই না!

—তার মানে যেতে বারণ করছেন তো। অদ্ভুত আপনি।

সুজয়া আর দু'তিনজন মহিলার সঙ্গে নিউ মার্কেটে এসেছিল। বেরিয়ে ট্যাক্সি পাচ্ছে না। বিকেলবেলা অফিস-ছুটির সময়। এখন ট্যাক্সি ধরে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।

অন্য মহিলাদের একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে সুজয়া আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। খুব সীরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি আজও বিয়ে করলেন না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুমি এখনও আমার বিয়ের ঘটকালির কথা ভাবছো নাকি?

—মোটেই না। আমার হাতে আর পাত্রী নেই। একজনই ছিল—তাকে তো আপনি বিয়ে করলেন না!

—একজন ছিল? কে বলো তো?

—আ-হা-হা! জানেন না? ন্যাকা! আপনি সত্যিই ন্যাকা—মনের কথাটা কখনও মুখ ফুট বলতে পারেন না?

আমি চুপ করে রইলাম! সুজয়া বললো, থাক গে, মধুবন নেই—তার জন্য আপনি আমাদের বাড়িতে আসাও ছাড়বেন? নাকি ভয় পান—হঠাৎ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! আপনি এখন মধুবনের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পান, তাই না?

কলকাতা শহরটা ছোট। একদিন দেখা হয়েই যাবে। মনীষার সঙ্গে কোনোদিন দেখা করবো না—এমন প্রতিজ্ঞাও তো আমি করিনি। এমনিই মনে হয়, না দেখা হওয়াই ভালো। শুধু শুধু এক ধরনের দুঃখ পাওয়া।

রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ের কাছে অরুণ হন হন করে

হেঁটে যাচ্ছিল। সেদিনের সেই কিল মারার শোধ নেওয়া হয়নি। পেটে চালালুম এক ঘুষি।

অরুণ মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর বললো, দেরি হয়ে যাবে। অলরেডি শো আরম্ভ হয়ে গেছে।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—মুক্তাঙ্গনে একটা থিয়েটার দেখতে।

—কি বই?

—নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র খুব ভালো হয়েছে শুনেছি। মধুবন আমাদের দেখাচ্ছে। মধুবনের জন্য আমাদের অনেক থিয়েটার দেখা হয়ে গেল। ও সবকটা দেখে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে, যা।

—চল, তুই যাবি? টিকিট পাওয়া যাবে কিনা জানি না অবশ্য। চল না গিয়ে দেখা যাক।

—না আমি দেখবো না। তুই যা।

—আরে চল্ না। কতক্ষণের আর ব্যাপার।

—না ভাই, আমার অন্য কাজ আছে এ পাড়ায়, এখন থিয়েটার দেখতে পারবো না।

—আমারও থিয়েটার-ফিয়েটার অত ভালো লাগে না। কিন্তু সুজয়াকে জানিস তো, না গেলে এমন কাণ্ড করবে!

—তাহলে আর দেরি করছিস কেন? যা—

অরুণ চলে যাবার পর আমার মনটা উসখুস করতে লাগলো। মনীষা এত কাছে আছে, তবু একবার দেখা হবে না? শুধু একটু চোখের দেখা। অন্য কোনো সময় এরকম মনে হয়নি। এখন অত কাছে আছে বলেই মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই তো আর কয়েক পা গেলেই মুক্তাঙ্গন—তবু আমি দূরে চলে যাবো? মনীষা শুনলে অপমানিত বোধ করবে না? মনীষাকে অপমান করার অধিকার আমার নেই। আমি তো অনায়াসেই মুক্তাঙ্গনে গিয়ে একটা টিকিট কেটে ঢুকে পড়তে পারি। যদি হাউসফুল হয়, টিকিট না পাওয়া যায়, তবুও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবর পাঠিয়ে ভেতরে ঢোকা খুব বোধহয় শক্ত হবে না। যাবো? গিয়ে মনীষার

পিঠে অজান্তে একটা কিল মেরে বলবো, এই খুকী!

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। কোনটা আমার পক্ষে বেশি উচিত, যাওয়া বা না যাওয়া, সেটা বুঝতে পারি না। হঠাৎ টের পাই, যেন আমার চারপাশে রাশি রাশি জল।

—কখন শো শেষ হবে?

গেটের কাছে দাঁড়ানো লোকটি বললো, সাড়ে ন'টা।

এখন সাড়ে সাতটা বাজে। এখন আর ভেতরে ঢোকা যায় না। নাটকের মাঝখানে ঢুকলে অন্যদের ডিসটার্ব করা হবে। শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। আরও দু'ঘণ্টা, কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় ঢুকে হেমন্তকে টেলিফোন করলাম। হেমন্ত ফেরেনি। বিলেত থেকে ফিরেছে তিনমাস আগে, কিন্তু এখন আবার কলকাতার বাইরে। হেমন্তকে পেলে অনেক সুবিধে হতো। হেমন্ত সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মনীষা এত কাছে, বসে বসে থিয়েটার দেখছে। আমার এখন মনীষার সঙ্গে দেখা করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে হেমন্তকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়!

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় ফিরে এলাম মুক্তাঙ্গনের সামনে। শো একটু আগেই ভেঙেছে। বেশ কিছু লোক বেরিয়ে গেছে। মনীষারাও যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধাবো। আমি যখন ফিরে এসেছি, তখন মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে। সব ব্যাপারটা আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। সাড়ে ন'টার সময় শো শেষ হবার কথা—তার পাঁচ মিনিট আগেই যদি ভেঙে যায়, আমি তার কি জানি! আমি গেটের কাছ থেকে কিছুটা দূরে বকুল গাছের নিচে দাঁড়ালাম।

না, ঐ তো মনীষা আসছে। সঙ্গে আছে সুজয়া, সীমা বৌদি, উষাদি, আর অরুণ! দীপঙ্কর নেই!

কাছাকাছি আসতেই আমি ডাকলাম, এই মনীষা! মনীষা চোখ তুলে খুঁজতে লাগলো। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম, মনীষা, আমাকে দেখতে পাচ্ছো না?

মনীষা শিশুর মতন উজ্জ্বল হয়ে গিয়ে বললো, তোমাকেই তো খুঁজছিলাম। কোথায় ছিলে এতদিন? একবার দেখা করতে

পারো না ? তুমি লক্ষ্ণৌতে এলে না কেন ?

—লক্ষ্ণৌতে যাওয়া কি আমার মানায় ?

—কিন্তু আমার যে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে !

—আমারও ইচ্ছে করে। মনীষা, চলো একদিন বেড়াতে যাই।

—কোথায় ?

—অনেক দূরে। মনে নেই, সারাজীবন আমাদের বেড়াবার কথা ছিল ? চলো, কোনো একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই।

—কোন পাহাড়ে ?

—খুব উঁচু কোনো পাহাড়ে। যেখানে বরফ থাকবে না, অথচ বেশ উঁচু—দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়। সেই পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে তোমাকে একটা খুব জরুরি কথা বলবো—

—কি জরুরি কথা ?

সেটা পাহাড়ে না উঠলে বলা যাবে না। সেখানে মাথার ওপরে শুধু আকাশ, পায়ের নিচে, অনেক নিচে মানুষের বসতি—আমাদের ধারে কাছে আর কেউ নেই—সেখানেই শুধু কথাটা বলা যায়। এখানে চারপাশে এত মানুষ। এত গোলমাল—এখানে সে কথা মানাবে না। জীবনে কোনোদিন যদি সে কথাটা না বলতে পারি—তাহলে এই বেঁচে থাকাটাই ব্যর্থ মনে হবে। যাবে আমার সঙ্গে একদিন পাহাড়ে ?

—যাবো। তুমি যেদিন ডাকবে, সেদিনই আমি যাবো। কিন্তু তুমি তো ডাকো না ?

—মনীষা, তুমি কেমন আছো ?

—আমি ভালো নেই।

—কেন, ভালো নেই কেন ? তোমাকে তো আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে—

—না, আমি ভালো নেই।

—কেন ?

—জানি না। সেটাও বুঝতে পারি না। সারাদিন বাড়ি বসে থাকি, ছেলেকে চান করাই, খাওয়াই। রেকর্ড শুনি। সন্ধ্যেবেলা ও এলে গল্প করি। অথচ মনে হয়, সারাদিন কিছুই করা হলো না।

কেন লেখাপড়া শিখলাম? কেন খেটে-খুটে এম এ পাশ করলাম?

—তুমি রিসার্চ করতে পারো—

—কি হবে রিসার্চ করে? ছেলে মানুষ করার জন্য রিসার্চ করার দরকার হয়?

—তাহলে ওখানে কোনো কলেজ-টলেজে পড়াও না।

—কি হবে কলেজে পড়িয়ে? আরও কত ছেলে মেয়ে চাকরি পায় না—তাদের টাকার দরকার, আমার তো সেরকম দরকার নেই টাকার।

—তাহলে কি করবে?

—জানি না। শুধু মনে হয়, সারাদিনে কিছুই করা হলো না।

—মনীষা, তুমি কোনো রকম কষ্টে আছো শুনলে আমার খুব খারাপ লাগবে। কষ্টে থাকা তোমার সাজে না।

—ঠিক কষ্টে যে আছি, তা বলা যায় না। একে তো কষ্ট বলে না। আমার মন ভালো নেই। আমি কলকাতায় ভালো ছিলাম।

—তা হলে তুমি কলকাতায় ফিরে এসো।

মনীষা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাই। অনেক দূরে, সবার চোখের আড়ালে—কোনো পাহাড় চূড়াতে হলেই ভালো হয়। সেই অসীম নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনীষাকে আমার জীবনের সার সত্য কথাটা বলতে হবে।

আচমকা মনীষা আমাকে বললো, সুনীলদা, তুমি আমাকে ভুলে গেছ!

—আমি? আমি তোমাকে কখনও ভুলতে পারি? তা কখনো সম্ভব!

—তুমি যদি আমাকে ভুলে যাও, তা হলে সেদিনই আমি মরে যাব। আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকবে না।

—শোনো, আমি তোমাকে যখন ডাকবো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো পাহাড় চূড়ায়?

—একথা কি দু'বার জিজ্ঞাসা করতে হয়? এতে কোনো সন্দেহ আছে?

—মনীষা, ঊষাদি ডাকছেন তোমায়। এবার তোমায় ট্যাক্সিতে উঠতে হবে।

—যাচ্ছি, একটু পরে যাচ্ছি।

মনীষা আমার বাহুতে ওর একটা হাত রাখলো। তন্নতন্ন চোখে দেখলো আমার মুখের দিকে। তারপর একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সুনীলদা, তুমি অনেক বদলে গেছো।

আমি সামান্য হেসে বললাম, হ্যাঁ বদলে গেছি। আমার দু'-পাশের জুলপি পাকতে শুরু করেছে। বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছি। চোখের নিচে কয়েকটা কালো দাগ পড়েছে—যাতে বোঝা যায় আমি এখন ব্যস্ত লোক।

মনীষা দুঃখী গলায় বললো, আমি সেরকম বদলের কথা বলিনি। তুমি এমনিই বদলে গেছ।

—না তো, আমি তো আর একটুও বদলাইনি! তুমিও বদলাওনি। কে বলবে, তোমার একটা ছেলে আছে? তুমি ঠিক আগের মতনই আছো। কয়েক বছর আগে সেই যে এক সন্ধ্যেবেলা বৌবাজারের মোড়ে তুমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলে—

—ট্যাক্সিতে হর্ন দিচ্ছে এবার আমি যাই?

—যাও। কথা রইলো, একদিন আমার সঙ্গে একটা খুব উঁচু পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। সেখানে একটা জরুরি কথা বলবো তোমাকে।—যা কোনোদিন বলা হয়নি, পাহাড় চূড়ায় না দাঁড়িয়ে বলা যায় না। যাবে তো?

—হ্যাঁ, যাবো। কথা দিলাম তুমি যেদিন বলবে···

অরুণই আমাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছিল। অরুণ কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি এক দৃষ্টে মনীষার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে মনে মনে কথা বলেছিলাম। কাছাকাছি আসতেই আমি ডাকলাম, এই মনীষা—

মনীষা চোখ তুলে খুঁজলো। আমাকে দেখে বললো, ও তুমি? আমি ভাবলাম হঠাৎ কে ডাকছে আমাকে এখানে গলাটা চেনা চেনা—

—এখন চিনতে পারছো?

—কষ্ট হচ্ছে চিনতে। অনেকদিন দেখিনি তো! কেমন আছো?

—ভালো আছি।

—কলকাতায় কতবার আসি, তোমার দেখাই পাই না।

—তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না!

—এই মিথ্যুক! দাদাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তোমার কথা। হেমন্তদা কেমন আছেন?

—ভালো।

—হেমন্তদার সঙ্গে দিল্লীতে একবার দেখা হয়েছিল। তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

—থিয়েটার কি রকম দেখলে?

—বেশ ভালো। তুমি দেখোনি?

—না।

—একদিন এসো না আমাদের বাড়িতে। আসো না কেন?

—যাবো। মনীষা, তুমি কেমন আছো?

মনীষা আমার চোখে চোখ রাখলো। ঠোঁটে সামান্য হাসির রেখা। যেমন চিরকাল দেখেছি। কপালের টিপটা একটু বাঁকা যেমন আগে দেখেছি। দু'এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর হালকা গলায় বললো, আমিও ভালো আছি।

আমি আর কোন কথা বললাম না। মনীষার চেহারা সামান্য একটু বদলেছে, চোখের নিচে সূক্ষ্ম একটা কালো দাগ। একটু যেন ক্লান্ত মনে হলো ওকে দেখে। তবু সেই ঝিকমিকে হাসির ভঙ্গিটি এখনো অক্ষুন্ন আছে। মনীষার সঙ্গে কোনোদিন পাহাড় চূড়ায় যাওয়া হবে না সত্যি সত্যি।

মনে মনে বললাম, মনীষা, বলেছিলাম না, একদিন আমাদের বয়েস বাড়বে, আমরা বদলে যাবো,—কিন্তু তোমার সেই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চেয়ে থাকার দৃশ্য—তা চিরকাল থেকে যাবে।

———